আনন্দদীপ

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

তৃতীয় বর্ষ ।। প্রথম সংখ্যা

২৮ ডিসেম্বর ২০২৫

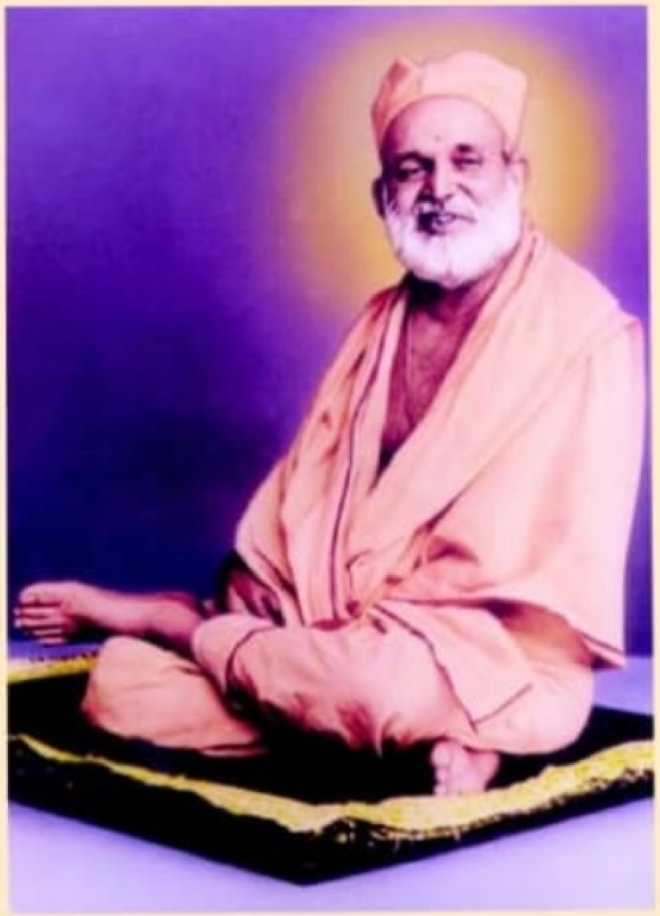

স্বামী সত্যানন্দদেব

ড. কৃষ্ণধন রায় (ড. কে. ডি. রায়, পরবর্তীকালে যিনি স্বামী কৃষ্ণানন্দ)

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস

(স্থাপিত : ১৯৭০)

(১৯৬৬ সালের ১৬ আগস্ট পথচলা শুরু হলেও UGC মঞ্জুরিক্রমে
১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্রাবাসের শুভসূচনা হয়)

আনন্দদীপ

(ছাত্রাবাস প্রাক্তনীবৃন্দের মুখপত্র)

৩য় বর্ষ ।। ১ম সংখ্যা
২০২৫

অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়

সাঁইথিয়া
বীরভূম-৭৩১২৩৪

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীবৃন্দের কার্যকরী কমিটি
[Executive Committee]
২০২৫-২৬

সভাপতি (President)	:	শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক (Secretary)	:	বুবুল সরকার
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক (Organising Secretary)	:	সুজিত কুমার দাস
সহ-সম্পাদক (Joint Secretary)	:	আবু তাহের মাসুম রাজা, সাগর কুমার দাস
কোষাধ্যক্ষ (Treasurer)	:	গিরিধারী দাস
সহ-কোষাধ্যক্ষ (Asst.Treasurer)	:	সুব্রত কুমার সাহা

সদস্য (Member)

সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলি
পলাশ সিনহা, মানবেন্দ্র রায়, রাকেশ ভকত
মলয় দাস, সুনীত সাহা, পার্থসারথী পাল,
পিন্টু মুখার্জী, রঞ্জিত কুমার সেন, নিরঞ্জন পাল, নূর আলি (মিলটন),
বাহালুল হক

পত্রিকা কমিটি

উপদেষ্টা মণ্ডলী (Advisory Committee)	:	জলদবরণ দত্ত, সুজিত কুমার দাস, মহঃ মোস্তফা কামাল, ভূমানন্দ সিনহা, সুধীরঞ্জন গাঙ্গুলী, পলাশ সিনহা, পলাশ ব্যানার্জী, তাপস সাহা, সাগর কুমার দাস
সভাপতি (President)	:	শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক (Publisher)	:	বুবুল সরকার
প্রকাশকাল	:	২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫
সম্পাদকমণ্ডলী (Editors)	:	অনিমেষ মণ্ডল, কুণালকান্তি সিংহরায়, সুরজিৎ রায়, রঞ্জিত কুমার সেন, কৌশিক ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ (Cover) ও অলংকরণ (Illustration)	:	কুণালকান্তি সিংহরায়
ডিজিটাল সহযোগিতা (Digital Help)	:	আবু তাহের মাসুম রাজা, সুব্রত কুমার সাহা, পার্থসারথী পাল

মুদ্রণ : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান
যোগাযোগ : ৭৯০৮০৫৯৯৪৭

শোকবার্তা

বিগত বছরে আমরা যাদের হারিয়েছি :

বলরাম গোস্বামী (প্রবেশবর্ষ ১৯৬৭)

কামাক্ষাচরণ ঘোষ (প্রবেশবর্ষ ১৯৮২)

গদাধর দাস (প্রবেশবর্ষ ১৯৮৬)

স্মৃতিভারাতুর হৃদয়ে আমরা তোমাদের স্মরণ করি। আমাদের এই বিরাট সংসারের আজকের এবং ভবিষ্যতের প্রতি পদক্ষেপে তোমরা আমাদের সঙ্গে আছো এবং থাকবে—তোমাদের স্মৃতির প্রতি এ আমাদের আন্তরিক অঙ্গীকার।

—সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের সকল প্রাক্তনীবৃন্দ

শুভেচ্ছাবার্তা

বীরভূমের সাঁইথিয়া শহর ছিল আমার কর্মক্ষেত্র, সুদীর্ঘ ৩০ বছর এই শহরে আমি কাটিয়েছি। বীরভূমের বাণিজ্য নগরী হিসেবে চিহ্নিত এই শহরটি অন্য অনেক দিক থেকে বীরভূমের অন্যান্য জনপদের থেকে আলাদা বলে আমি মনে করি। প্রথমত বীরভূমের পাঁচটি সতী পীঠের একটি এই শহর। দ্বিতীয় এবং সর্বশেষ যেটা, আমার মনে হয় জেলায় এরকম দৃষ্টান্ত আর কোথাও নেই সম্ভবত। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলি। এই শহরে অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয় নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেখানে সত্যানন্দ ছাত্রাবাস নামক একটি ছাত্রাবাস বর্তমান। এই ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীরা প্রতিবছর পুনর্মিলন-এর দিন 'আনন্দদীপ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। সেই পত্রিকা এই বছর তৃতীয় বর্ষে পা দিতে চলেছে। পত্রিকায় কলেজের প্রাক্তনীরা তাদের অনুভবের কথা লেখে। একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে চলে গিয়ে কর্মজীবনের বৃহত্তর লড়াইয়ের ময়দানে শামিল হবার পরেও ফেলে আসা দিনগুলিকে মনে রাখা ব্যাপারটা খুব সাধারণ বিষয় নয় এবং এই জায়গাতেই আমাদের সাঁইথিয়া শহর অনন্য এবং অসাধারণ। এই বছরেও সেই পত্রিকার প্রকাশ ঘটতে চলেছে। আমি আন্তরিকভাবে প্রার্থনা করব যে, এই ঐতিহ্য যেন পরবর্তীকালেও এই ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীরা বহন করে নিয়ে যায়। বীরভূম জেলায় সাঁইথিয়া এভাবেই নজির সৃষ্টি করুক বারবার।

শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা সহ—

অতনু বর্মন

বিশিষ্ট কবি ও অভিনেতা

STD Code No.: 03462
E-mail ID: - sntmunicipality@gmail.com

Phone : SNT 265252

OFFICE OF THE COUNCILLORS

SAINTHIA MUNICIPALITY

P.O.-SAINTHIA : DIST.-BIRBHUM

From: The Chairman/Executive Officer
SAINTHIA MUNICIPALITY

Memo No. :- 57 /S3/NULM Sec./SNT. M/2025-26
Date :- 04/07/2025

To
The Bubul Sarkar,
Secretary,
&
Shovan Mukhopadhyay,
President,
Sainthia Satyananda Chhatrabas Ex-boarder Alumni.

Sub: - Letter for acceptance of the proposal for donation of a Refrigerator to the AASTHA BHAVAN under this Municipality.

We are very much thankful to you and your members of Sainthia Satyananda Chhatrabas Ex-boarder Alumni for offering a refrigerator as a donation to AASTHA BHAVAN for the use of under privileged inmates of this shelter homes.

We are feeling very glad in accepting this donation in the interest of the under privileged section of the society and you may kindly arrange for its delivery at your convenient date.

Thanking you for this act of kindness towards humanity at large.

With regards,

04/07/25
Executive Officer
Sainthia Municipality
Sainthia, Birbhum

সাঁইথিয়া 'আস্থা ভবন'-এ সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীবৃন্দের তরফে একটি রেফ্রিজারেটর প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ পৌরসভার এই শংসাপত্র।

সূচিপত্র

কার্যকরী কমিটির সম্পাদকের প্রতিবেদন	বুবুল সরকার	৯
সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের পূর্ণমিলনী উৎসবে সভাপতির প্রতিবেদন	শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়	১০
পত্রিকা সম্পাদকের কলমে...		১৩
সত্যানন্দ ছাত্রাবাস (অফিসিয়াল)—এক বন্ধন, এক পরিবার		১৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি		
বাংলা দূরদর্শনের সুবর্ণজয়ন্তী	মহঃ মোস্তফা কামাল	১৭
কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা : সংশ্লিষ্ট কুশল প্রার্থনা	অনিমেষ মণ্ডল	১৮
সার্ধ-দ্বিশতবর্ষের আলোকে রামমোহন স্মরণ প্রসঙ্গ : সতীদাহ এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম	কুণালকান্তি সিংহরায়	২২
ভূপেন হাজারিকা : সুরের নদীতে মানুষ-ভাসানো এক বাঙালি	আবু তাহের মাসুম রাজা	৩৩
স্মৃতির আলোয়		
হোস্টেলের স্মৃতির পাতা থেকে	জলদবরণ দত্ত	৩৬
অতি চালাকির মজা	তুষার ভট্টাচার্য	৩৮
পাঞ্জাবি হোটেলে ডিনার	সন্দীপ দাস	৪০
পুরানো সেই দিনের কথা	তাপস সাহা	৪২
সত্যানন্দের দিনগুলি, স্মৃতির পাতায় এক হোস্টেল জীবন	মুরারী কৃষ্ণ সাহা	৪৪
একটি ক্লাসিক হোস্টেল জীবনের গল্প	পূর্ণচন্দ্র সরকার	৪৫
অতীত-বর্তমান ও আমি	গোলাম আম্বিয়া	৪৮
স্মৃতিটুকু থাক	দেবব্রত ঘোষ	৫১
প্রণবেন্দু কাপ ২০০৬ : সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের মাঠে একটি স্মৃতির শুরু	পার্থসারথি পাল	৫২
ফিরে দেখা	আদিত্য দে	৫৪
চোখের দেখা, প্রাণের কথা...	কৌশিক ভট্টাচার্য	৫৬
সাক্ষাৎকার		
ছাত্রাবাসের দীর্ঘসময়ের রন্ধনকর্মী নিতাইদা-র অনন্য সাক্ষাৎকার	সুজিত দাস	৫৯
চিঠির ভাষায়		
বড় দুঃখে, সুখ	শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়	৬২
প্রবন্ধ		
রবীন্দ্র সাহিত্যে মহাবিশ্ববীক্ষণ	ভূমানন্দ সিনহা	৬৩
অজয়দা ফিরে এল নতুন রূপে	কল্যাণ মিত্র	৬৯
Shukrayaan : India's latest attempt of interplanetary exploration	Dr. Md Mosarraf Hossain	৭১
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার	পলাশ সিনহা	৭৫

কবিতা ও ছড়া

স্মৃতিগাঁথা	বিষ্ণুচরণ পাল	৭৮
পথশিশু	সুব্রত চৌধুরী	৭৯
তুমি আছো	সাগর কুমার দাস	৭৯
সেই দুর্গাপুকুরের চারপাশ	মোহাম্মদ সাদউদ্দিন	৮০
ছাত্রাবাসে	সিদ্ধার্থ ঘোষ	৮০
হাতে গড়া প্রাচীর	সুজিত কুমার দাস	৮২
বন্ধন	বুবুল সরকার	৮৩
সুখের পায়রা	স্বপন বাগদী	৮৩
জেগে আছে চাঁদ	অনিরুদ্ধ বিশ্বাস	৮৪
প্রিয়তমা	কেরামত আলি	৮৫
ভুল তো ভাঙতে চায় না	সন্দীপ গোলদার	৮৫
ডাক দেয় পুনর্মিলন	বিষ্ণুচরণ পাল	৮৬
Friendship..	Hafizul Kabir	৮৬

গল্প

ভৌতিক পুকুরপাড়	রামকৃষ্ণ পাল	৮৭
Die Another Day	Sahebul Islam	৯০

ভ্রমণ

নেপাল ২০২৫ : এক ভ্রমণ কথা	গিরিধারী দাস	৯৩

নাটক

মুখোশ রাজ্যের গল্প	সুরজিৎ রায়	৯৬

অন্যরকম

টুকরো কথা	১০২
শব্দছক	১০৫

বাইরের জানালা

2025 Nobel Prize laureates along with their categories and countries:	১০৭
‘আনন্দদীপ’-২০২৪ সংখ্যাকে যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন :	১০৮
LIST OF MEMBERS OF SATYANANDA CHHATRABAS ALUMNI 2025	১১০

কার্যকরী কমিটির সম্পাদকের প্রতিবেদন

আমার প্রিয় দাদাবন্ধুরা সমবয়েসী বন্ধুরা আর ভাইবন্ধুরা, আমাদের প্রিয় সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীবৃন্দের সপ্তম পুনর্মিলন উৎসবে আবারও আমরা মিলিত হতে চলেছি আমাদের হোস্টেলের পরিচিত উঠোনে, নস্ট্যালজিক ক্রিকেট মাঠে আর 'আনন্দদীপ'-এর পাতায় পাতায়। সময়ের হিসেবে সবাই একটু বুড়ো হয়েছি, কিন্তু যোগাযোগের আন্তরিকতায় আমরা আরো কাছাকাছি এসেছি, আরো সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছি।

এই এক বছরে আমরা আমাদের নিজেদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরো মজবুত করেছি অফিসিয়াল গ্রুপ তৈরির মাধ্যমে। আমাদের দাদা, ভাই বন্ধুদের বিপদে যতটা পেরেছি ছুটে গেছি, পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। পারিবারিক আনন্দের দিনেও সামিল হয়েছি পরিবারের সদস্যের মত। আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি সাধ্যমত। সাঁইথিয়া শহরের একটি অনাথাশ্রম 'আস্থা ভবন'-কে একটি রেফ্রিজারেটর প্রদান করতে পেরেছি। এই কাজের জন্য সাঁইথিয়া পৌরসভা আমাদের শংসাপত্র প্রদান করেছে। এই প্রশংসা আমাদের সবার পরম প্রাপ্তি। ছাত্রাবাসের বর্তমান আবাসিকদের কাছে বারবার ছুটে গেছি, কখনো সরস্বতী পুজোর নিমন্ত্রনে, কখনো এমনিই, শুধু ওদের পাশে থাকার জন্য।

আমরা কার্যকরী কমিটির সদস্যরা বারবার নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসেছি শুধু আরো কিছু ভালো কাজ করার প্রচেষ্টায়। সবই আমাদের প্রিয় ছাত্রাবাসের জন্যে। সমস্ত পরিকল্পনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি স্বীকার করি। আমাদের ভাবনায় আছে, আলোচনায় আছে আরও অনেক কিছু।

যে উঠোন একদিন অনেক স্বপ্ন বুনে আমাদের ছেড়ে দিয়েছিল জীবনযুদ্ধে, তার জন্যেই বারবার এই ফিরে আসা। সঙ্গে থাকে কিছু ফিরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে; অনেক চেনামুখকে, চেনা সময়কে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে। সারা বছর ধরে সেই ইচ্ছেটা জমতে জমতে যখন সবার সঙ্গে দেখা হয়, সেই তরুণ বয়সের উঠোনটা তখন একটা বিরাট আকাশ হয়ে যায়। বন্ধুত্বের সীমানাটা বেড়ে যায় অনেকখানি। তখন আর আমরা বুড়ো হই না, আরো বড় হই।

বৃহত্তর বন্ধুত্বের খোঁজ চিরন্তন। কবিগুরুর কথা দিয়ে শেষ করি—

"জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে
বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে"

বুবুল সরকার

সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের পূণর্মিলনী উৎসবে সভাপতির প্রতিবেদন

আমার প্রাণপ্রিয় সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনীবৃন্দ,

প্রথমেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি, যে সকল প্রাক্তনী, প্রাক্তনীদের নিকট আত্মীয় স্বজন ও সমাজের বিশিষ্ট মানুষজন যাঁরা আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন, না ফেরার দেশে। তাঁদের প্রত্যেকের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

উপস্থিত সকলকে পুণ্যদিনের এই অবসরে যথাযোগ্য স্থানে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, অকৃত্রিম ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা নিবেদন করি। আমার সন্তানপ্রতিম বর্তমান আবাসিকদের প্রাণভরা ভালোবাসা জানাই। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আগামী দিনে তারা যেন সকলে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের নিজেদের পরিবারের সাথে সাথে আমাদের এই বৃহত্তর পরিবারকেও গৌরবান্বিত করে।

'সত্যানন্দ ছাত্রাবাস' নামটি শুধুমাত্র একটি ছাত্রাবাসের নাম নয়, এটি একটি আবেগের বহিঃপ্রকাশ। শব্দ দুটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের মধ্যে যে অনুরণন ঘটায়, সেই অনুরণনের বাস্তবচিত্র আজকের এই জনপ্লাবন।

প্রিয় সাথী, আমরা হয়তো অনেকেই, ব্যক্তিজীবনে অথবা পেশাগত জীবনে, এক বা একাধিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত আছি বা ছিলাম। কিন্তু বোধ একটু জাগ্রত করলেই আমরা দেখতে পাব, অন্য সংগঠনের সঙ্গে আমাদের এই সংবদ্ধতার বেশ কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে। আমাদের মধ্যে বিভিন্নতার শেষ নেই। বিভিন্ন হয়েও আমরা একসঙ্গে আছি, সেই ৬০-এর দশক থেকে ২০০০-এর কলেজ জীবন কাটানো এক দঙ্গল। আমরা অনেকেই এখানে পাচ্ছি, পিতৃপ্রতিম দাদাদের অথবা পুত্রপ্রতিম ভাইদের। সামান্য ছোট বড় দাদা ভাইদের।

আমরা বিভিন্ন আর্থসামাজিক পরিকাঠামো থেকে উঠে এসেছিলাম, কিছু বছর আমরা একত্রে বসবাস করেছিলাম, পরবর্তী জীবনে আমরা অনেকেই সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছেছি, আবার আমরা অনেকেই জীবন যুদ্ধে সেভাবে হয়তো সফল হতে পারিনি। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য আছে, ধর্মের বিভিন্নতা আছে। এ যেন সেই বিভিন্ন বনফুলের মালা, যেটা একটামাত্র শক্ত সুতোয় বাঁধা। শক্ত সুতোটার নাম 'সত্যানন্দ ছাত্রাবাস'। এখানে সত্যি সত্যিই ফুলের কোন পরিচয় নেই, মালাটির পরিচয়ই আমাদের পরিচয়। ব্যক্তিগত পরিসরে সেই ফুল যতই সুন্দর বা সুবাসিত হোক না কেন! এই ছাত্রাবাস আমাদের শিখিয়েছে 'আমি' থেকে 'আমরা' কিভাবে হতে হয়। 'আমার' থেকে 'আমাদের' কিভাবে হয়। পরবর্তী জীবনে, এই পাঠ আমাদের কতটা কাজে লেগেছে, আজ আমরা বোধহয় সেটি অনুধাবন করতে পারছি।

মূলতঃ আশির দশকের কয়েকজন প্রাক্তনীর ঐকান্তিক চেষ্টায় ২০১৮ সালে একত্রিত হওয়ার চেষ্টায় যে ধারাটির সুত্রপাত এবং অবশ্যই তার আগে উৎপন্ন হওয়া নব্বইয়ের দশকের কয়েকজন প্রাক্তনী সৃষ্ট ধারা (যেটি মাঝখানে অন্তঃসলিলা হয়ে গিয়েছিল) দুটি ধারা একত্রিত হওয়ায় আজ স্রোতস্বিনী এই ধারায় বয়ে চলেছে। আমরা সকলেই এই ধারায় প্রাণভরে অবগাহন করছি।

আজ আমরা আক্ষরিক অর্থেই একটি বৃহৎ পরিবার। আজ আমরা একজনের ব্যাথায় ব্যাথাতুর হই, আবার একজনের সাফল্যে উৎফুল্ল হই। আজ আমাদের সকলের দায়িত্ব এবং কর্তব্য এই ধারাকে সচল রাখা, এই মালাকে সজীব ও আঘাতমুক্ত রাখা।

প্রিয় সাথী, তোমাদের বদ্যানতায় আমার

একবারে জন্মলগ্ন থেকে সাধারণ প্রাক্তনী ও কার্যকরী কমিটির সদস্য হিসেবে যুক্ত থাকার সুযোগ ও সৌভাগ্য হয়েছে। আমার বয়সের দ্বিগুণ না হলেও তার কাছাকাছি বয়সের দাদাদের ছাত্রাবাসের বিভিন্ন ব্যাপারে যেরকম উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখেছি, সেটা শিক্ষণীয় ও অনুকরণ যোগ্য। আবার ছোট ছোট ভাইয়েরা যাদেরকে এই কয়েকবছর আগেও চিনতাম না, জানতাম না, ছাত্রাবাসের যেকোনো কাজের ব্যাপারে কি উৎসাহ!

নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা দিয়ে যেভাবে সংগঠিত রূপটিকে আধুনিক করার চেষ্টা করছে সেটিকে তোমরাও বাহবা দেবার কথা ভাববে বলে মনে হয়। যেমন website, database, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। এটির পেছনে কয়েকজন নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। যেখানে আমাদের প্রাক্তনীদের বিভিন্ন রকমের তথ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বছরের পুনর্মিলনী উৎসবের ছবি, ভিডিও এগুলো দেখা এবং সুখ স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ থাকবে।

আজকের শুভদিনে রেজিস্ট্রিকৃত সকল প্রাক্তনীদের হাতে একটি 'স্থায়ী সচিত্র পরিচয় পত্র' তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত। এটি কার্যকরী কমিটির কয়েকজন সদস্যের নিরলস পরিশ্রমের ফসল। আমি আলাদা করে কারোর নাম উল্লেখ করছি না। কিন্তু আমাদের বর্তমান কমিটির সম্পাদক যেভাবে সমস্ত ব্যাপারে আন্তরিক সচেষ্ট হয় এবং সকলের সাথে যোগাযোগ রেখে চলে কোন প্রশংসাই ওর জন্য যথেষ্ট নয়। ও বয়সের আমার থেকে অনেক ছোট, তবুও তার এই কর্মপ্রেরণা আমার কাছে প্রণম্য।

একসঙ্গে কাজ করার এই সুযোগে, কয়েকজন ছোট ভাইদের কর্মপদ্ধতি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের আন্তরিকতা, উদ্দীপনা ও ছাত্রাবাসের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। যদিও এই কমিটির প্রধান হিসেবে আমার ভূমিকা অনেকটা 'নৈবেদ্যর উপর বাতাসার মতো'। যা করার ওরাই করে। নিরন্তর পরিশ্রম করে। যা কিছু সাফল্যের কৃতিত্ব সবটুকুই ওদের প্রাপ্য। আমি শুধু ওদের নিয়ে গর্ব বোধ করি।

আমাদের সাধ অফুরাণ, কিন্তু সাধ্য সীমিত। তোমাদের সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ও অর্থানুকূল্যে কিছু 'সামাজিক উন্নয়নে' আমরা অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছি। সাঁইথিয়া-স্থিত একটি ভবঘুরে আবাসস্থল 'আস্থা'-তে সেখানকার আবাসিকদের বাস্তবিক প্রয়োজনে, সাঁইথিয়া পৌরসভার মাধ্যমে একটি 'রেফ্রিজারেটর' প্রদান ক'রে, সেখানকার আবাসিকদের কাছ থেকে আমাদের সকল প্রাক্তনীদের জন্য আশির্বাদ কুড়িয়ে নিতে পেরেছি।

বর্তমান আবাসিকদের আবদারে সাড়া দিয়ে এবং ছাত্রাবাসের পরম্পরাকে বজায় রাখতে, সরস্বতী কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে তাদেরকে উৎসাহিত করতে সরস্বতী পুজো-তে কিছু আর্থিক সহায়তা করা হয়।

এই সংবদ্ধতা তৈরি হওয়ার পর থেকে, প্রথমদিকে আমাদের এই বৃহত্তর পরিবারের কোনো আত্মীয় স্বজন বিয়োগের মত মর্মান্তিক পরিস্থিতিতে কার্যকরী কমিটির পক্ষ থেকে সশরীরে উপস্থিত থেকে আমাদের সামর্থ্য মত শ্রদ্ধা নিবেদন রীতি চালু হয়েছিল, পরিবারের কলেবর বৃদ্ধি হওয়ায় সেই রীতি এখন শুধুমাত্র প্রাক্তনীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি।

এছাড়া কোথাও কোনো প্রাক্তনী অসুস্থ বা বিশেষ কোনো অসুবিধার খবর কার্যকরী কমিটির কাছে থাকলে, সেই অঞ্চলের অধিবাসী প্রাক্তনীদের সংবদ্ধ করে, সশরীরে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করে 'পাশে থাকার বার্তা' দেওয়ার সর্বোতভাবে চেষ্টা করে।

তবে, পুরো পথ যে কুসুমাবিস্তৃত, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিছু কন্টকদংশন আমাদেরকে ব্যথিত করে। আমি নিজে একজন আশির দশকের প্রথম দিকের প্রাক্তনী। যে কোনো কারণেই হোক, আশির দশকের প্রাক্তনীদের অনেকের মধ্যে এই সংগঠনের প্রতি বিমুখতা আমাদের উৎকণ্ঠিত করে সবসময়। বিশেষ করে ২০১৮ সালে যেসমস্ত প্রাক্তনী এই সংগঠনটি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ভীষণ রকমের নিস্পৃহ। এই ঘটনা, আমাদেরকে প্রতিনিয়ত দংশন করে।

এই পরিস্থিতির নিরসনে আমরা বহুবার তাদের সাথে ব্যক্তিগত স্তরে যোগাযোগ করেছি। তাদের অভিযোগ ব্যক্ত করার অনুরোধ করছি, এমনকি এই

পরিস্থিতি নিরসনে 'মহম্মদ যদি, পর্বতের কাছে না আসে, তবে পর্বতই মহম্মদের কাছে যাবে' এই আপ্তবাক্য-কে মাথায় রেখে, সভাপতি সম্পাদক সহ কয়েকজন কার্যকরী কমিটির সদস্য কলকাতায় গিয়ে, (নিজেদের খরচে) কলকাতাস্থিত প্রাক্তনীদের সমবেত করে বর্তমান কমিটির কর্মপদ্ধতি ও আশু লক্ষ্য বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করা হয়। সেখানে আমাদের কিন্তু কিছু অসাধারণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়। সেখানে বিশেষ করে আশির দশকের দু'জন প্রাক্তনী যেভাবে সহায়তা ও সমস্ত কিছুর সুবন্দোবস্ত করে, সেটা এককথায় অপূর্ব ও অসাধারণ। তাঁরা হয়ত তাদের ভাই বা দাদাদের জন্য করতেই পারে, কিন্তু তাদের সহধর্মিনীদ্বয়, একজনের নিকট আত্মীয় বিয়োগের মতো মর্মান্তিক ঘটনা ঘটা এবং আর একজনের প্রচণ্ড শারিরীক অসুস্থতা সত্ত্বেও নিজে হাতে 'দাদা ভাইদের' জন্য রান্না করে খাওয়ান (প্রায় ২০-২৫ জনকে)। তাঁদের এই অবদান আমরা কোনদিন ভুলতে পারব না। এই অবসরে, তাঁদের দুজনকে সকল প্রাক্তনীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

এতদসত্ত্বেও যে কয়েকজন প্রাক্তনী এখনো এই সংগঠনের প্রতি নিরুত্তাপ পোষণ করছে তোমাদের সকলের মাধ্যমে তাদের কাছে কাতর অনুরোধ, 'তোমরা ফিরে এসো'। যদি কোথাও ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে কমিটির প্রধান হিসেবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমাদের মধ্যে 'মতান্তর' থাকতেই পারে কিন্তু 'মনান্তর' যেন কখনো স্থান না পায়।

আরো একটি পীড়াদায়ক বিষয়, বর্তমানে ছাত্রাবাসের আবাসিক সংখ্যা। এখানে অনেক বিদগ্ধ ও পণ্ডিত মানুষজন আছে। তাদের কাছে অনুরোধ, বিষয়টি পর্যালোচনা ক'রে, প্রয়োজনে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ক'রে, হোস্টেলকে আবার সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে উদ্যোগী ভূমিকা নেওয়ার।

পত্রিকা কমিটির সেইসব প্রাক্তনীদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই, যারা নিজেদের পেশাগত জীবনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও শুধুমাত্র 'আনন্দদীপ'-এর প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা ও হোস্টেলের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে প্রায় প্রত্যেক প্রাক্তনীর কাছে লেখা পাঠানোর অনুরোধ, সংকলন ও গ্রন্থনা করে সফল ভাবে তোমাদের কাছে আজ উপস্থাপন করছে।

পর্দার সামনে অথবা পিছনে থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকের এই সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন যারা করেছে, সেই সমস্ত প্রাক্তনীদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

কৃতজ্ঞতা জানাই, অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও পরিচালন সমিতির সদস্যদের, যাঁরা আমাদের প্রিয় এই ছাত্রাবাস চত্ত্বর-কে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন। এখানে আমাদের ভীষণ রকমের সতর্ক থাকতে হবে, আমাদের কোন কার্যকলাপ যেন ছাত্রাবাসের শৃঙ্খলার পরিপন্থী না হয়।

ছাত্রাবাসের বর্তমান কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। বর্তমান কমিটি কিছু কাজ করার চেষ্টা করেছে। কিছু কাজ বাস্তবায়ন হয়তো সম্ভব হয়নি। যদি কিছু কৃতিত্ব পাওয়ার থাকে, সেটুকু প্রাপ্য কমিটির সকল সদস্যদের। যেটুকু ব্যর্থতা আছে তার দায় কমিটির প্রধান হিসেবে সম্পূর্ণ ভাবে আমার। আমি নতমস্তকে এই ব্যর্থতার দায়ভার গ্রহণ করছি।

আশা করি, আগামী দিনে যারা দায়িত্বে আসবে, তারা সফলভাবে এই সংগঠনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, সংগঠনকে কলুষমুক্ত রাখতে, কিছু জনের কাছে অপ্রিয় কিছু সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। আশাকরি সকল সংবেদনশীল প্রাক্তনী, বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে, কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাবে।

সকলকে পুনরায় ধন্যবাদ।

আগামী নতুন বছর সবার ভালো কাটুক, এই প্রার্থনা জানাই।

শোভন কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৮২)
সভাপতি
কার্যকরী কমিটি
সত্যানন্দ ছাত্রাবাস প্রাক্তনী সংঘ

পত্রিকা সম্পাদকের কলমে...

আমাদের প্রাণের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনী পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে আবার মিলিত হয়েছি আমরা। প্রকাশিত হল আমাদের প্রিয় 'আনন্দদীপ'। পায়ে পায়ে এবার তৃতীয় বছর আমাদের এই পত্রিকার।

জীবনের কিছু সময় আমরা রেখে এসেছিলাম একদিন আমাদের প্রিয় ছাত্রাবাসের অমল আঙিনায়। হয়ত আমরা কেউই সেদিন বুঝিনি সেই ঊষার আলোর মহত্ত্ব। ছাত্রাবাসের সুবর্ণ সময়-রেখায় সহযাত্রী হয়েছিলাম শুধু। মিলে মিশে গিয়েছিলাম সবার সঙ্গে, সবকিছুর সঙ্গে। তারপর সময়ের নিয়মে বিচ্ছেদ, 'সূর্যের বল্লম হাতে অশ্বারোহী' হওয়ার এক আদিত্যবর্ণ স্বপ্নবীজ বুকে নিয়ে।

ছাত্রাবাসে কাটানো স্মৃতিময় সময়ের সেই স্বরলিপি আজও আমাদের মনের গভীরে উজ্জ্বল। সুন্দরের অবস্থান ক্ষণস্থায়ী হলেও তার স্থায়িত্ব অসীমপ্রসারী। তারা রয়ে যায় মনে, স্মৃতিতে; আর ফিরে ফিরে আসে গল্পে কথায়, কবিতায়—'আনন্দদীপ'-এর পাতায় পাতায়।

সময়ের কিছু দাবি থাকে আমাদের কাছে। সব সময় না হলেও কখনও কখনও সাড়া দিতে পারি আমরা। আমাদের প্রিয় ছাত্রাবাস আজ পূর্বের গৌরবময় সময় হারিয়েছে। তাই তার পাশে আমাদের দাঁড়ানোর সময় এসেছে আজ। প্রাক্তনী আবাসিকবৃন্দের তৈরি কার্যকরী কমিটি আমাদের সবাইকে জুটিয়ে নিয়ে সেই চেষ্টা করছে বড় আন্তরিকভাবে। 'আনন্দদীপ' সেই প্রচেষ্টার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমরা কলম ধরলাম, ল্যাপটপ আর মোবাইলের কি প্যাড খুলে বসলাম—লিখব বলে। প্রাক্তনী দাদা, ভাই বন্ধুরা হাত বাড়িয়ে দিল আবার তাদের প্রিয় পত্রিকার জন্য। কখনও তাদের হাতভর্তি জুঁই অথবা শিউলি ফুলের মত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনি, নাটক এবং আরও ভিন্ন স্বাদের লেখা; আবার কখনও প্রয়োজনীয় তথ্য বা ডিজিটাল সহযোগিতার ডালি। সকল সুবাসিত মণি-মুক্তো আমরা দু'হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করলাম।

এই প্রথম আমাদের প্রিয় নিতাইদা-র (ছাত্রাবাসের দীর্ঘ সময়ের জনপ্রিয় রন্ধনকর্মী) একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল এই সংখ্যায়। নিতাইদার গ্রামে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এল আমাদেরই একজন বর্ষীয়ান প্রাক্তনী। এ লেখার, এ স্বাদের ভাগ হবে না। কারণ, সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রাক্তনী ছাড়া আর কেউ এর গভীরতা অনুভবের ক্ষমতা ধরেন না।

পত্রিকাকে বহুবর্ণে সাজিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের মাটি শক্ত করল আমাদেরই মানুষজন। যে সকল প্রাক্তনী আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল আনন্দদীপ-এর জন্য, তাদের হাত আমরা মাথায় তুলে নিলাম।

আমাদের অন্তরের আয়নায় প্রতিফলিত সমস্ত কথামালা আর ছবি বেঁচে থাকুক আনন্দদীপের পাতায় পাতায়। হয়ত ভবিষ্যতের কোনো একলা সময়ের একান্ত অবসরে এই দীপ মনের ভেতর দীপাবলী হয়ে উঠবে। এই বিশ্বাসের আলো জ্বেলে সবার হাতে তুলে দিলাম আমাদের এবারের সংকলন।

পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস (অফিসিয়াল)—এক বন্ধন, এক পরিবার

প্রিয় প্রাক্তন আবাসিকগণ,

২০২৫ সালের ৩ জুন আমাদের প্রাণের আশ্রয়স্থল 'সত্যানন্দ ছাত্রাবাস (অফিসিয়াল)' নামে একটি নতুন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সূচনা করা হয়েছে। এই গ্রুপটি বর্তমানে ছাত্রাবাসের একমাত্র অফিসিয়াল এবং কার্যকরী গ্রুপ হিসেবে বিবেচিত।

এই নতুন গ্রুপের প্রয়োজনীয়তা কেন?

সম্প্রতি বিভিন্ন প্রশ্ন অনেকের মনে দেখা দিয়েছে, যেমন—

- ○ এই নতুন গ্রুপ কেন তৈরি করা হল?
- ○ পুরাতন গ্রুপগুলো কি এখন ব্রাত্য হয়ে গেল?
- ○ সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের গ্রুপ কি এখন থেকে 'পেইড' হয়ে গেল?
- ○ গ্রুপে কি সদস্যরা ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাদ পড়বেন?
- ○ গ্রুপ বিভাজনের উদ্দেশ্য কী?
- ○ ইসি কমিটি এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে কি?

আপনাদের সকলের প্রশ্নের প্রতি সম্মান জানিয়ে, নীচে কিছু প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা দিচ্ছি।

সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা :

প্রতি বছর রিইউনিয়ন-এর দিন, উপস্থিত সদস্যদের সর্বসম্মতিক্রমে কার্যকরী কমিটি (ই.সি) নির্বাচিত হয়।

এই কমিটির মূল দায়িত্ব হল—

১) বার্ষিক রিইউনিয়ন-এর সুষ্ঠু আয়োজন।

২) হোস্টেলের ঐক্য, মর্যাদা এবং সম্মান বজায় রাখা।

৩) প্রাক্তনদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক-মানবিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবস্থাপনা এই দায়িত্বেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আমরা বুঝি, সকলের মত এক নয়। কিন্তু ছাত্রাবাসের বৃহত্তর স্বার্থে ই.সি কমিটিকে কখনো কখনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

ইসি কমিটির ভূমিকা ও দায়িত্ব

প্রতি বছর রি-ইউনিয়ন দিবসে উপস্থিত সদস্যদের সম্মতিক্রমে ইসি কমিটি গঠিত হয়। এর প্রধান কাজ রি-ইউনিয়ন সফলভাবে পরিচালনা করা। তবে অতিরিক্ত কিছু সামাজিক ও মানবিক কার্যক্রমও ইসি কমিটি গত বছরগুলোতে করে এসেছে যেমন—

- প্রয়াত প্রাক্তনীদের স্মরণ এবং পরিবারের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ।
- অসুস্থ প্রাক্তনীদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা। অসুস্থ প্রাক্তনীদের খোঁজ খবর রাখা (খবর পেলেও শারীরিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানসিক ও শারীরিক ভাবে পাশে থাকার চেষ্টা।
- ইচ্ছুক প্রাক্তনীদের সন্তানদের ক্যারিয়ার গাইডেন্স।
- কোভিড-১৯ সময়কালে আর্থিক সহায়তা এবং যোগাযোগ রক্ষা।
- প্রয়াত কিছু প্রাক্তনীদের আর্থিক সাহায্য (সকল ইচ্ছুক আবাসিকদের চেষ্টায়)
- কিছু ক্ষেত্রে মেডিক্যাল আর্থিক সহায়তা (সকল ইচ্ছুক আবাসিকদের চেষ্টায়)।
- ছাত্রাবাসের ছোটখাটো উন্নয়নমূলক কাজ।
- পত্রিকা প্রকাশ।
- সোস্যাল সার্ভিস এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক উদ্যোগ।

এছাড়াও সকল কাজের সফলতা নির্ভর করে আপনাদের আন্তরিক সহযোগিতার উপর।

পুরাতন ডিজিটাল গ্রুপগুলো নিয়ে কিছু কথা :

- Satyananda Chattrabas (প্রতিষ্ঠাতা : অরূপ দত্ত, সদস্য : ৩০০+)
- Be like a Flower (প্রতিষ্ঠাতা : মলয় দাস, সদস্য : ২০০+)

ইসি কমিটির ভূমিকা :

- সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা।
- বিভিন্ন প্রাক্তনীকে যুক্ত করা।

তবে কিছু সমস্যাও :

- ব্যক্তিগত আক্রমণজনিত অপ্রীতিকর ঘটনা।
- রাজনৈতিক/ধর্মীয় পোস্টের কারণে বিরূপ পরিবেশ।
- Forwarded মেসেজের আধিক্য।
- তথ্য সংগ্রহ করে সহযোগিতায় অনীহা।
- ব্যক্তিগত প্রচার বা ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :

ইসি কমিটি আজ পর্যন্ত কোনো সদস্যকে গ্রুপ থেকে Remove করেনি, বরং সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য রক্ষা করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

নতুন গ্রুপের সদস্যদের (রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত) :

- প্রতি বছর ৩১ মার্চের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা বাধ্যতামূলক।
- যাঁরা ইচ্ছুক, তাঁরা এককালীন ১০০০ টাকা প্রদান করে আজীবন সদস্যপদ (Life Membership) গ্রহণ করতে পারবেন (২০২৫ সালের ডিসেম্বর Reunion-এর পর থেকে)।
- রেজিস্ট্রেশন ফি মূলত Reunion-এর ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের অর্থনৈতিক সহায়তা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

রেজিস্ট্রেশনের কারণ ও গুরুত্ব :

১) আর্থিক সহায়তা :

- রিইউনিয়নে অংশগ্রহণ ব্যক্তিগত বিষয়। তবে সারা বছরব্যাপী ছাত্রাবাসের অন্যান্য সামাজিক উদ্যোগে এবং রিইউনিয়ন-এর প্রাথমিক আয়োজনের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- রিইউনিয়নের জন্য যেসব অপরিহার্য খরচ থাকে, যেমন—চেয়ার-টেবিল, স্টেজ, মাইক ভাড়া, ইত্যাদি।
- সরস্বতী পূজার জন্য এলুমনি (প্রাক্তনী)-দের তরফ থেকে কিছু চাঁদা প্রদান।
- রিইউনিয়ন সংক্রান্ত ই.সি কমিটির মিটিং-এ চা-নাস্তার খরচ ইত্যাদি।

২. সহমর্মিতার বার্তা :

আপনার রেজিস্ট্রেশন ফি-ই প্রমাণ করে আপনি ছাত্রাবাসের পাশে আছেন।

৩. মনস্তাত্ত্বিক সংযুক্তি :

এটি আপনার মানসিকভাবে ছাত্রাবাসের সাথে যুক্ত থাকার প্রকাশ।

২০২২ সাল থেকে রেজিস্ট্রেশন ফি চালু হয়েছে এবং আগামী দিনেও তা বজায় থাকবে।

গ্রুপের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কিছু নিয়মাবলী :

- ☑ ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিতর্ক এড়িয়ে চলা।
- ☑ দেশের সাংবিধানিক ব্যক্তিত্বদের প্রতি সম্মান বজায় রাখা।
- ☑ যাচাই না করে বিভ্রান্তিকর খবর বা লিংক শেয়ার না করা।
- ☑ ফোন স্টোরেজ সমস্যার কারণ হওয়া থেকে বিরত থাকা (অতিরিক্ত ভিডিও/ছবি না পাঠানো)।
- ☑ অশ্লীল কনটেন্ট, ব্যক্তিগত আক্রমণ, নিজস্ব প্রচার বা বিজ্ঞাপন না করা।
- ☑ ফরোয়ার্ডের পরিবর্তে ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়া।

নিয়ম লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে :

প্রথমে সতর্কতা, অতঃপর প্রয়োজনে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতে পারে।

দায়বদ্ধতা স্পষ্টীকরণ :

- শুধুমাত্র অফিসিয়াল গ্রুপেই ই.সি কমিটি তাদের কর্মপ্রতিবেদন, পরিকল্পনা এবং তথ্য প্রকাশ করবে।
- অন্য কোনো গ্রুপের পোস্ট, মন্তব্য বা কর্মকাণ্ডের দায়ভার ই.সি কমিটি নেবে না।
- অন্য গ্রুপে আপনি থাকবেন কিনা, সেটি সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত পছন্দ। ই.সি কমিটি এই বিষয়ে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না।

শেষ কথা :

এই গ্রুপটি আমাদের সম্মিলিত স্মৃতি, সম্মান ও ভবিষ্যতের উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দু। আপনি অন্য গ্রুপে থাকবেন কিনা, সেটি আপনার একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তবে, ছাত্রাবাসের মূল কর্মকাণ্ডের সংবাদ এখানেই প্রদান করা হবে। আশা করি ভবিষ্যতে আরও বেশি রেজিস্টার্ড সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাব।

ধন্যবাদ ও শুভকামনা

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস ইসি কমিটি (২০২৫)

বাংলা দূরদর্শনের সুবর্ণজয়ন্তী

মহঃ মোস্তফা কামাল

(প্রবেশবর্ষ ১৯৮৩ হায়ার সেকেন্ডারি)

বাংলা দূরদর্শন পথ চলা শুরু করে ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট। শহর গ্রাম বাংলার সকলের কাছে দূরদর্শন ছিল বিস্ময় বাক্স। বাক্সের সুইচ অন করলে চলমান ছবি। সিনেমা হলে বড়ো পর্দায় সিনেমা অনেকেই দেখেছেন কিন্তু দূরদর্শন অন্য মাত্রা যোগ করল। খবর পড়া, খেলা, সাক্ষাৎকার এরকম নানা অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার আমাদের অবাক করে দিয়েছিল। আমাদের ছোটবেলায় সকলের ঘরে ছিল না। আমার ভালো মনে পড়ে বুধবার রাত ৮ টায় ছায়াছবির গানের অনুষ্ঠান আমাদের গ্রামের একজনের বাড়িতে দেখতে যেতাম। সেখানে গ্রামের অনেক লোক একসাথে বসে দেখার আনন্দ উপভোগ করতেন। কয়েক বছর পর গ্রামের আরো কয়েকজন বাড়িতে আনেন, কিন্তু তখনো আমাদের বাড়িতে ছিল না। সেইসময় মহাভারত সিরিয়াল খুব খুব জনপ্রিয় ছিল, আমি একজনের বাড়িতে দেখতে যেতাম। বাংলা দূরদর্শনের কথা মনে করলে পুরনো নানা স্মৃতি মনে পড়ে। আমাদের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে তখন ছিল না, আমরা নন্দিকেশ্বরীতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতদিন ক্রিকেট খেলা দেখেছি। বাংলা দূরদর্শন ছিল তখন এক ও অদ্বিতীয়। বর্তমানে অনেক চোখ ধাঁধানো মজাদার চ্যানেল হয়েছে যা জনসাধারণের মনকে আকর্ষণ করার দিকে নজর দেয়। জনগণ যেটাতে সহজেই আকৃষ্ট হবে সেরকম অনুষ্ঠান তাদের মাধ্যমে প্রচারিত হয়। বাংলা দূরদর্শন এখনও ব্যাতিক্রমী। তারা সমাজ, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান উদ্ভাবনী শিক্ষার কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠান নির্বাচন করে। শিল্পী, বিজ্ঞানী, সমাজের নানা শ্রেণির লোকেদের নিয়ে সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বাংলা দূরদর্শন আমাদের অনেক পূর্বের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়। বাংলা দূরদর্শনের কথা মনে করলে আমাদের সমসাময়িকদের পুরনো নানা স্মৃতি মনে পড়ে। শনি-রবিবারের ছায়াছবি দেখার জন্য পরিবারের সকলে ঘরে বসে পড়তাম। একসাথে দেখা সে এক চরম আনন্দের সময় ছিল। ২০২৫ এ দূরদর্শনের ৫০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই দীর্ঘ পথ চলায় অন্যান্য অনেক চ্যানেলের সঙ্গে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় দূরদর্শন পিছিয়ে পড়লেও গুণগত মানের বিচারে আজও সবার উপরে আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। বাংলা দূরদর্শন তার ঐতিহ্য বজায় রেখেই স্বমহিমায় চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে নিশ্চিতভাবেই।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা : সংশ্লিষ্ট কুশল প্রার্থনা

অনিমেষ মণ্ডল
(প্রবেশবর্ষ ১৯৯৩)

আমি তখন সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র। থাকি কলেজ সংলগ্ন সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে। আমাদের সেই প্রায় গ্রামীণ ছাত্রাবাসে প্রতি বছর একটা অনুষ্ঠান হত, যার নাম বিদায় সংবর্ধনা। সেখানে চলতি বছরে যাদের কলেজ জীবন শেষ হয়ে যেত তাদের বিদায় জানানো হতো। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষ থেকেই সেই অনুষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে এসে পড়ে। সেই অনুষ্ঠানকে আমি যতটা সম্ভব সাজানোর চেষ্টা করি। সেখানে গান, আবৃত্তি এইসব বিষয়ের প্রতিযোগিতাও রাখা হতো। সেই বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমি নিজেও আবৃত্তি করতাম। সেরকমই এক পরিসরে একদিন আবৃত্তি করেছিলাম 'অমলকান্তি'। সেদিন হয়ত কতকটা না বুঝেই আমার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল একটি চিরন্তন কবিতার স্বর। তারপর থেকেই ওই কবিতাটি আষ্টেপৃষ্ঠে এমনভাবে বেঁধে ফেলে আমাকে যে আমি অমলকান্তি নামক একটি বৃত্তের চতুর্দিকে আবর্তিত হতে থাকি। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখে অমলকান্তির রোদ্দুর হতে চাওয়ার যন্ত্রণা। সেই তীব্র আকুতি আমাকে, আমাদের সকলকে তোলপাড় করে যারা একদিন সকলেই রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। আসলে রোদ্দুর হওয়াটা ঠিক কী রকম, সে কি আমরা বুঝি! নাকি ওই হতে চাওয়াটাই সবকিছু! কেন না তার বিপ্রতীপে রয়েছে সফল হয়ে ওঠার এক অমোঘ হাতছানি। কেরিয়ার গড়ে তোলার সুতীব্র বাসনা। যদি কেউ কেউ অন্য পথে হাঁটে তাদের জন্য কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন এক অন্যতর পথের যা অন্যকে আলো দেয়, আর আলো দিতে দিতে নিজেই পুড়ে যায়। আবার সেই লাজুক রোদ্দুর বৃষ্টিস্নাত জাম আর জামরুলের পাতায় অল্প একটু হাসির মতো লেগে থাকে। এই একটি অমলকান্তি তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখতে পারে। একটি কিশোর তার স্বপ্নভঙ্গের সব যন্ত্রণা নিয়ে আগামীর পথে চলে। একজন বেকারের আত্মকথা এ যেমন তেমনই হতাশা আর বিমর্ষতার মাঝে এক অন্ধকার গলিঘুঁজির পথ তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। তবু তাঁর হতাশা বা ব্যর্থতা বোধ নেই। মানুষের সত্ত্বা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে থাকে তার অন্ধকার ছাপাখানার জীবন। এতটাই সে মানবিক বোধে উজ্জ্বল যে বিদায়ের সময় খানিকটা এগিয়েও দিতে আসে। আপাত দৃষ্টিতে যে ঘটনা খুব সাধারণ মনে হতে পারে তাই ভালোবাসার অমোঘ বন্ধন রচনা করে। পেশা দিয়ে আর যাই হোক বন্ধুত্বের বিচার হয় না এটা কবি

সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

আমরা কেউ মাস্টার হতে চেয়েছিলাম,
কেউ ডাক্তার, কেউ উকিল।
অমলকান্তি সে-সব কিছু হতে চায়নি।
সে রোদ্দুর হতে চেয়েছিল!
ক্ষান্তবর্ষণ কাক-ডাকা বিকেলের সেই লাজুক
রোদ্দুর,
জাম আর জামরুলের পাতায়
যা নাকি অল্প একটু হাসির মতো লেগে থাকে।

(অমলকান্তি/অন্ধকার বারান্দা, ১৩৬৭)

এমনই ছিলেন আমাদের কিশোর বেলার কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত কোনওদিন হয়নি। তবু টিভিতে, খবরের কাগজে একচিলতে রোদ্দুরের মতো তাঁর হাসিমুখটুকু দেখে পরম তৃপ্তি অনুভব করেছি। এই তৃপ্তি যতটা না উচ্চারণের তার চেয়ে অনেক বেশি উপলব্ধির। সহজ অথচ গভীর তাঁর কবিতাগুলি আমাকে মোহিত করেছে বারবার।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জানেন কীভাবে মানুষ চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে তার সমূহ জীবন ও যাপন নিয়ে এক চরম উজ্জীবনের দিকে হেঁটে যায়।কারণ তাঁর কবিতার একেবারে ভাববিন্দুতে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ আর তার জাগতিক আনন্দ বেদনায় ঘিরে থাকা এক উত্তুঙ্গ বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাস করেন এই বিশ্বাসটুকু আছে বলে মানুষ বহুদূর যেতে পারে। তাই প্রেম আর অপ্রেম নিয়ে তাঁর সাজানো বাগানের বিপুল সম্ভার। সেইখানে সভ্যতার ক্রমাগত উত্থান আর পতন আর তার সাথে সাথে সাধারণ জীবনের অপ্রতিরোধ্য চলাচল।

প্রায় সাত দশক ধরে ক্রিয়াশীল তাঁর কবিজীবন। এ এক বিরল সৌভাগ্যও বটে। এক বিস্তৃত জীবনের অভিজ্ঞতা আর তার নির্যাসটুকু নিয়ে তাঁর এই জীবনব্যাপী পরিক্রমা খুব সহজ ছিল না। তবু তিনি বিশ্বস্ত থেকেছেন সময়ের প্রতি সর্বোপরি নিজের প্রতি। এক গভীর মানবিক মূল্যবোধের কাছে নিজেকে মেলে ধরেছেন সবটুকু দিয়ে। এই সততাটুকু তাঁকে দশক থেকে দশকান্তরে জীবন্ত করে রেখেছে। কখনও ফিকে হতে দেয়নি তাঁর জীবনবোধের রং ও ভূমিকা।

কবি নীরেন্দ্রনাথের দৃষ্টি ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। এক ভূলুণ্ঠিত সমাজ আর তার ততোধিক বিপর্যস্ত মানুষের উপাখ্যান যেন তাঁর কবিতার একটি দিগন্ত। এই দিগন্তে তিনি সম্রাট। এই সমাজের এক শ্রেণির মানুষের অনপনেয় অসহায়ত্ব তাঁকে বারবার বেদনাতুর করেছে। তিনি হয়ত তাদের জন্য কিছুই করে উঠতে পারেননি। কিন্তু এক জাগ্রত বিবেকের দরজা সদা উন্মুক্ত রেখেছেন। তাঁর হৃদয় বারবার কেঁদে উঠেছে মানবতার অপমানে। মানবতার জয় তাঁর জীবনের অন্যতম আকাঙ্ক্ষা। এখানেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও তাঁর কবিতার অনিবার্য জয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তর্জনী উঁচিয়ে ধরতে তিনি ভয় পান না।

তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো...কখনও বলবে না...
কাকে...তুমি ভয় দেখাও কাকে...
আমি অনায়াসে সব ভেঙে ফেলতে পারি...
মুহূর্তে তছনছ করে দিতে পারি সবকিছু...
বাঁ পায়ের নির্দয় আঘাতে আমি সব
মুছে ফেলতে পারি...
তর্জনী দেখিয়ে কেন কথা বলো...কখনও বলবে না...

(তর্জনী/নীরক্ত করবী, ১৩৭১)

একজন দীর্ঘদেহী রোগা মানুষ। অথচ তাঁর কবিতা কত অমোঘ শক্তির অধিকারী। কোথাও কপট কল্পনার আশ্রয় নেই। যা বলেন ঋজুভাবে বলেন। প্রতিটি কবিতা টান টান মেদবর্জিত অথচ বোধের শীর্ষবিন্দুকে ছুঁয়ে থাকে। তাঁকে দেখলে মনে হবে তাঁর দৃষ্টি নামানো মাটির দিকে। একটা মগ্নতা ঘিরে আছে তাঁকে সবসময়। যেন একটা জীবন শুধু কবিতার জন্য উৎসর্গীকৃত। আসলে তাঁর গভীরে যে প্রজ্ঞাময় সত্তা ছিল তা তাঁকে চিরসত্যের দিকে নিয়ে গেছে। কলকাতার এক বিচিত্র নাগরিক সমাজ দৃষ্টি এড়ায় না এই আদ্যন্ত নাগরিক কবির। তাদের হতাশা ও ক্ষোভ, প্রেম ও দুর্নীতি, করুণা ও কৌতুক, বেদনা ও বিদ্রূপ কিছুই তাঁর দৃষ্টির বাইরে নয়। তাই একের মোড়কে তিনি ধরে রাখেন সমষ্টিকে। যা একজন কবির সফল সামাজিক দায়বোধের পরিচায়ক। তাই 'হ্যালো দমদম' (উলঙ্গ রাজা, ১৯৭১) শুধুমাত্র সত্তরের জলমগ্ন কলকাতার ছবি নয়, তা এক উগ্র আধুনিক ও

অতিবিড়ম্বিত জীবনের প্রকাশও। আবার বাতাসি (নক্ষত্র জয়ের জন্য/১৩৭৬) কবিতায় বাতাসির অসহায় নীরব আর্তি বাতাসেই ভেসে যায়। তাকে অনুভব করতে পারলেও আমরা অনুধাবন করতে পারি না বা করি না। এই অসহায়ত্ব কবির সঙ্গে আমাদেরও বেদনাহত করে তোলে। শাসকের সমস্ত কপটতার বিরুদ্ধে শিশুটির মতোই তখন আমাদের কণ্ঠ যেন সোচ্চার হতে চাই। শুধু এক ভীতি কাজ করে গোপনে গোপনে। আবার 'কলঘরে চিলের কান্না' (উলঙ্গ রাজা) কবিতায় এক স্বপ্ন সন্ধানী মানুষের কিছু কাপুরুষের হাতে লাঞ্ছনার যন্ত্রণাদীর্ণ ছবি ফুটে ওঠে। এসবই কবির সমাজ মনস্কতার এক গভীর ছায়াপাত। যা তাঁকে কখনও হিসেব করে করতে হয়নি। এক সহজাত বোধ ও সংশ্লিষ্ট কুশল প্রার্থনা তাঁকে সর্বগ্রাহ্য করে তুলেছে। আবালবৃদ্ধবনিতা এমন কোনও পাঠক নেই যিনি নীরেন্দ্রনাথের কবিতা পড়েননি। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাটির অংশবিশেষ একবার পাঠ করা যেতে পারে...

শিশুটি কোথায় গেল?
কেউ কি কোথাও তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে?
নাকি সে পাথর ঘাস মাটি নিয়ে খেলতে খেলতে
ঘুমিয়ে পড়েছে
কোনো দূর নির্জন নদীর ধারে,
কিংবা কোনো প্রান্তরের গাছের ছায়ায়?
যাও তাকে যেমন করেই হোক খুঁজে আনো।
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির উর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক:
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

সমাজের সমস্ত ভণ্ডামি আর কপটতাকে একেবারে নগ্নভাবে উন্মোচন করেছেন কবি এই কবিতায়। স্তাবকবৃন্দের হাততালির বিপ্রতীপে এক প্রবল প্রতিস্পর্ধী প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এক শিশুর কণ্ঠে। শিশু এখানে প্রতীক। আসলে প্রতিবাদ করতে গেলে সত্যদ্রষ্টা হতে হবে, হতে হবে নির্মোহ। লোভ লালসা থেকে অনেক উঁচুতে উঠে, পাওয়া না পাওয়ার হিসেব না করে শুধুমাত্র সত্যকে অবলোকন করা এবং তা নির্দ্বিধায় প্রকাশ করতে গেলে শিশুর মতো নির্ভীক মন দরকার। যে হিসেব না করেই কথা বলতে পারে। শিশুর রূপকে কবি আগামীর নাগরিককে শাসকের ভন্ডামি আর কপটতার মুখোশ ছিঁড়ে দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এক গভীর শুভবোধের জারণে কবির অন্তরাত্মা জারিত না হলে এই উচ্চারণ কীভাবে সম্ভব!

তরুণ কবিদের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল উল্লেখ করার মতো। প্রাণের আন্তরিকতা ছিল তাঁর চরিত্রের ঐশ্বর্য। কখনও জীবন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তাঁর মুখখানা আপাত গম্ভীর মনে হলেও তিনি ভীষণ রসিক ছিলেন। তাঁর 'কবিতার ক্লাস' বইখানি আগামী প্রজন্মের কবিদের দিশা দেখাতে পারে। অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁর হাত ছিল অসাধারণ। আগাথা ক্রিস্টির 'টেন লিটল নিগার্স'-এর অনুবাদ 'দশ পুতুল' আমাদের মুগ্ধ করে। তাঁর আত্মজীবনী 'নীরবিন্দু' একটি অসামান্য গদ্যগ্রন্থ। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, গদ্যকার ও সাংবাদিক। দীর্ঘকাল আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সম্পাদনায় অনবদ্য। বানান ও প্রয়োগবিধি সম্পর্কে এক জীবন্ত হ্যান্ডবুক। আজকের অনেক ফেক নিউজের যুগে তাঁর আদর্শ বড় শিক্ষণীয়। তিনি বলতেন, 'সত্যিটাকে রাখো। মিথ্যেগুলো ঝেড়ে ফেলো।'

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কোনও রাজনৈতিক দল নেই। কিন্তু তাঁর কবিতায় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট আছে। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ছাড়া কোনও কবি বোধহয় সম্পূর্ণ হতে পারেন না। আর বিশেষত যাঁর কবিতার আশ্রয় মানুষের জীবনচর্যা তাঁর তো নয়ই। তাই হয়ত বহু রাজনৈতিক ঘটনার অভিঘাত তাঁর কবিতার পরতে পরতে সংলগ্ন হয়ে আছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্রমবিবর্তন, আর্থ সামাজিক পটভূমি, দেশভাগ ও তার প্রেক্ষিতে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় তাঁর সজাগ দৃষ্টি কখনও এড়ায় না। চল্লিশের দশক তাঁর কাছে এক টালমাটাল দশকের সূচক। সেই পরাধীন ভারতবর্ষের

সেই বিক্ষুব্ধ দিনগুলি তিনি লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন চল্লিশের দিনগুলি (১৯৯৪) কাব্যগ্রন্থে। এখানে লক্ষণীয় প্রথম যৌবনের সেই উত্তাল সময়ের কথা তিনি লিখলেন অনেক পরিণত বয়সে যখন তাঁর কাব্যভাষা অনেকখানি গভীরতাকে স্পর্শ করে থাকে।

নিশির ডাক শুনে
মাঝরাত্তিরে যারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছিল,
এখন আবার
খুব শান্ত আর খুব সুন্দর এই সকাল বেলায়
একে- একে সেই ছেলেগুলো যে যার
ঘরে ফিরে আসছে।

(নিশির ডাক/ চল্লিশের দিনগুলি)

তাঁর কবিতা দিনে দিনে আরও আত্মমগ্ন হয়ে উঠেছিল। সমসাময়িক রাজনীতির জটিল আবর্ত থেকে বহুদূরে মানবযাত্রীর যুগান্তরের গান হয়ে বেজে ওঠে সেইসব মর্মভেদী কবিতা। তখন তিনি জীবনকে দেখেন কিছুটা নির্মোহ দৃষ্টিতে। এক স্বতন্ত্র ভাবনার রসায়ন ছড়িয়ে পড়ে সমাজ জুড়ে। তাঁর মৌলিক অবলম্বন যে কবিতা সেখানে তিনি ভীষণ প্রত্যয়ী। তাই তাঁর কবিতায় কোনও ছলনার আশ্রয় নেই। যা আছে তা হলো সুউচ্চ মূল্যবোধ আর গভীর সংবেদনশীলতা। আত্মকেন্দ্রিক মানুষের অহং সর্বস্বতা তাঁকে সতত ব্যথিত করে। দেশভাগ তিনি নিজে চোখে দেখেছেন বলে ভাঙনের কবিতা লিখতে গিয়ে কষ্ট পেয়েছেন খুব। অবিভক্ত ভারতের বাংলায় অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার চান্দ্রা গ্রামে ১৯২৪ সালের ১৯ শে অক্টোবর তাঁর জন্ম। মৃত্যুঞ্জয়ী এই কবি মৃত্যুকে অনিবার্য জেনেও তাকে অস্বীকার না করে জীবনের দিকে ঝুঁকেছেন বেশি করে। মৃত্যু চেতনাকে ছাপিয়ে তাঁর কবিতার চরম আকুতি জীবনের পরিব্যপ্ত গানে ও জাগরণের ভিতর। মৃত্যু এক স্থিরবিন্দু কিন্তু জীবন এক চলমান বস্তু—এই সত্য তাঁর কাছে ধ্রুব। সেই সত্যের কাছে নতজানু থেকে এক জীবনব্যাপী কবিতাসাধনা করে তিনি পৃথিবীর মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন ২০১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। বাংলা কবিতার ভাগ্যাকাশে হয়ে রইলেন এক ধ্রুবতারা। কবিতা তাঁর কাছে ছিল রণাঙ্গন। এই রণাঙ্গন ছেড়ে কোনও দিন ফিরতে চাননি শান্তির সংসারে নিশ্চিত আরামের ঘরে। মানবতার কবিতা রচনা ছিল তাঁর আজন্মের সাধনা। জীবন আর কবিতা তাঁর কাছে সমান্তরাল। কবিতার নির্দিষ্ট কোনও কাল নেই, কালান্তর নেই। কবিতা কেবল বয়ে চলে যুগ থেকে যুগান্তরে। তাঁর অমলকান্তি, বাতাসি, বার্মিংহামের বুড়ো, নক্ষত্র জয়ের জন্য, কলঘরে চিলের কান্না, উলঙ্গ রাজা, সত্য সেলুকাস, সাকুল্যে তিনজন, জঙ্গলে এক উন্মাদিনী প্রভৃতি কবিতা বাংলা সাহিত্যের পাতায় চিরদিনের আশ্রয় করে নিয়েছে। যতদিন বাংলা কবিতা থাকবে ততদিন কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী থাকবেন। তাঁর প্রয়াণ বলে কিছু নেই। তিনি শুধু তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে চার্মিনার গোল্ড টানতে টানতে দিগন্তের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন। শুধু মাটির টানে ঈষৎ ঝুঁকে আছেন মাটির দিকে...

এখন যাবার বেলা, এখন জানালা বন্ধ করে
থাকা ঠিক নয়।
যতই এগিয়ে আসে যাবার সময়
ততই মলিন এই ঘরে
জানালার পথে যেন আসে আরও আলো, আরও হাওয়া।
অন্ধকারে কে নেবে বিদায়।
যে যাবে সে পিছনে খানিকটা আলো দেখে যেন যায়,
তা নইলে কীসের জন্য যাওয়া।

সার্ধ-দ্বিশতবর্ষের আলোকে রামমোহন স্মরণ

প্রসঙ্গ : সতীদাহ এবং সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর অপ্রতিরোধ্য সংগ্রাম

কুণালকান্তি সিংহরায়

(প্রবেশ বর্ষ ১৯৯৪)

"THIRTY-SEVEN YEARS after they were accused of glorifying the death of Roop Kanwar, India's last known case of sati, a Jaipur special court on Wednesday acquitted eight persons giving them the benefit of doubt."

(ভাবানুবাদ : সাঁইত্রিশ বছর পরে, ভারতের সর্বশেষ পরিচিত সতীদাহ মামলা রূপ কানওয়ারের মৃত্যুকে মহিমান্বিত করার অভিযোগে, বুধবার জয়পুরের একটি বিশেষ আদালত আটজনকে বেনিফিট অব ডাউট দিয়ে মুক্তি দিয়েছে।)

The Indian Express (১০ অক্টোবর, ২০২৪ সাল)

খুব বেশি দিনের কথা নয়। আজ থেকে মাত্র ৩৮ বছর আগেকার ঘটনা। সময়টা ছিল ১৯৮৭ সাল। স্থান হল রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর থেকে ৮০ কিলোমিটার দূরে শিকর জেলার দেওরালা গ্রাম। ঐ বছরের ৪ সেপ্টেম্বর সেখানে একটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল, যাতে করে শুধু আসমুদ্রহিমাচল নয় ; সারা বিশ্ব তোলপাড় হয়েছিল। এমনকি ঘটনার আকস্মিকতায় ও আতঙ্কে শিহরিত হয়েছিল খোদ রাষ্ট্রসংঘও। কী হয়েছিল সেখানে? মাল সিং নামে ২৪ বছরের জনৈক এক রাজপুত যুবকের মৃত্যু হলে তাঁর অষ্টাদশী স্ত্রী রূপ কানোয়ার সহমৃতা হন। না, রূপ কানোয়ার স্বেচ্ছায় সতী হননি। তাকে জোরজবরদস্তি করে মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়। ১৮৩৩ সালে লন্ডনে মার্কিন চিত্রকর রেমব্রান্ট পিল-এর আঁকা প্রতিকৃতি।

সতীদাহ প্রথা কী?

'সতী' শব্দের অর্থ কী? বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এ.এল. ব্যাসাম সতীর অর্থ করেছেন পূণ্যবতী নারী। অন্যদিকে সুকুমারী ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, কোনো ভারতীয়

ভাষাতেই 'সতী' শব্দের কোনো পুংলিঙ্গবাচক প্রতিশব্দ নেই। অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এটি শুধুমাত্র নারীর প্রতিই প্রযোজ্য ছিল। প্রশ্ন হলো, সতীদাহ বিষয়টি কী? এককথায়, সদ্যবিধবা নারী তার মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় আরোহণ করে আত্মাহুতি দেওয়ার ঘৃণ্য প্রথাকে সতীদাহ বলা হত। উদ্দেশ্য ছিল, স্বর্গলোকে চিরকাল স্বামীর সঙ্গে অনাবিল সুখলাভ ও অখণ্ড পূণ্যের অধিকারিণী হওয়া। শুধু তাই নয়, সতী হওয়ার অর্থ ছিল সমকালে সেই নারীকে দেবীত্বের পর্যায়ে উন্নীত করে তার মহিমাকীর্তন করা হত। এমনকি বংশ কৌলিন্যকে গৌরবোজ্জ্বল করার ক্ষেত্রেও সতী প্রথা ছিল মধ্যযুগে অদ্বিতীয়। মনে রাখা দরকার, মৃত পত্নীর চিতায় বিপত্নীক স্বামীর আত্মবিসর্জন দেওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত ভারতীয় ইতিহাসে নেই। একটু গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করলে দেখা যাবে যে, সতীদাহের মতো বর্বর কুপ্রথার পিছনে যে কারণটা ভারতীয় উপমহাদেশের সমাজে প্রধান ক্রিয়াশীল ছিল, তা হল অর্থনৈতিক।

প্রাচীনত্ব

সতী প্রথার শিকড়টা অত্যন্ত প্রাচীন। 'ইতিহাসের জনক' হেরোডটাসের মতে, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মধ্য এশিয়ার সিথিয়ানদের মধ্যে বিধবাদের দাহ করার প্রথা প্রচলন ছিল। ভারতে সহমরণের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ম্যাসিডোনীয় সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে আগত ডিওদেরাস, অ্যারস্টোবুলাস, স্ট্যাবো প্রমুখ গ্রিক লেখকদের রচনায়। ৩১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রাচীন ভারতের তক্ষশিলায় এক ভারতীয় যোদ্ধার মৃত্যু হলে, প্রথম পত্নী অন্তঃস্বত্তা থাকার জন্য তার দ্বিতীয় স্ত্রী সহমরণে গিয়েছিলেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন স্বয়ং গ্রিক লেখক ডিওদেরাস।

ভারতীয় মহাকাব্যগুলির মধ্যে রামায়ণে সতীদাহের কোনো ঘটনার উল্লেখ নেই। মহাভারতেও সতী প্রথা বাধ্যতামূলক ছিল না। পাণ্ডুর মৃত্যু হলে অনুতপ্ত মাদ্রী সহমরণে গিয়েছিলেন প্রধানত প্রায়শ্চিত্তের জন্য। তবে সত্যবতী (রাজা শান্তনুর পত্নী), অম্বিকা ও অম্বালিকা (বিচিত্রবীর্যের দুই মহিষী), কুন্তী (পাণ্ডুর প্রথমা পত্নী), সুদেষ্ণা (বিরাট রাজার পত্নী), ভানুমতী (দুর্যোধনের সহধর্মিণী), উত্তরা (অভিমূন্যর পত্নী) প্রমুখ বৈধব্যে জীবিত ছিলেন। এমনকি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত বীরদের বিধবা পত্নীগণেরও সতী হওয়ার উল্লেখ মহাভারতে নেই। অন্যদিকে শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পরে তাঁর পাঁচ পত্নী (রুক্মিণী, গান্ধারী, শৈবা, হৈমবতী ও জাম্ববতী) অনুমৃতা হয়েছিলেন; কিন্তু সত্যভামা ও অন্যান্য পত্নীরা তপশ্চর্যার জীবন গ্রহণ করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় নারীর আত্মাহুতি দেওয়ার প্রথা ছিল সহমরণ। অন্যদিকে অনুমরণ হল, স্বামীর মৃত্যুর পরে অন্য চিতায় পত্নীর আত্মবিসর্জন দেওয়ার প্রথা।

ধর্মশাস্ত্রে সতীদাহ প্রথা

এখন প্রশ্ন হল, হিন্দুশাস্ত্রে কি সহমরণের আদৌ কোনো বিধান ছিল? গবেষিকা সুব্রতা সেন এইমর্মে দেখিয়েছেন যে, মনুসংহিতা সহ একাধিক উত্তর বৈদিক সাহিত্য (সমস্ত ব্রাহ্মণ ও উপনিষদগুলি) এবং প্রধান প্রধান স্মৃতিগ্রন্থ সমূহে সহমরণ অনুপস্থিত। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের দুটি অপ্রধান শাস্ত্র, যথা, বিষ্ণুস্মৃতি ও বৃহদ্দেবতা গ্রন্থে পরোক্ষভাবে হলেও সহমরণের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। একইভাবে ষষ্ঠ শতকের প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের (আনু. ৫০৫-৫৮৭ খ্রিস্টাব্দ) 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থেও সহমরণকে সমর্থন জানানো হয়েছে। এমনকি দশম-একাদশ শতকে রচিত কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে একাধিক সহমরণের বিবরণ রয়েছে। সতীদাহের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হল, বর্তমান মধ্যপ্রদেশের এরাণ গ্রামে প্রাপ্ত ৫১০ খ্রিস্টাব্দের গোপরাজের শিলালিপিটি।

পণ্ডিতদের মতে, আসল সমস্যাটা হয়েছে ঋগ্বেদের (আনু. রচনাকাল : ১৫০০-১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) একটি সূক্তের দুর্ভাগ্যজনক বিকৃতির ফলে। ভুল হল—শুধুমাত্র একটি শব্দের বিকৃতি। ইন্দো-ভাষাগোষ্ঠীর সুপ্রাচীন এই গ্রন্থের দশম মণ্ডলের 'ইমা নারীর অবিধবা...' মন্ত্রের (১০/১৮/৭) শেষাংশে 'জনয়ো যোনিমগ্রে' শব্দের

পরিবর্তে 'জলযোনিমগ্নেঃ' হয়েছিল 'ব্রহ্মপুরাণ' নামে দশম-একাদশ শতকে রচিত একটি অর্বাচীন উপপুরাণে। অর্থাৎ ঋগ্বেদে এই সূক্তের মূল অর্থ ছিল— 'মায়েরা আগে বেদীর দিকে এগিয়ে যান'। কিন্তু সূক্তটির বিকৃতরূপ হল এইরকম—'নারী অগ্নিতে আত্মাহুতি দিক!' এই বিকৃতিকে ভিত্তি করে শাস্ত্রকাররা, বিশেষত ষোড়শ শতকে নবদ্বীপের স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন (১৫২০ -১৫৭৮ খ্রি.) সহমরণ প্রথাকে বাংলার হিন্দুসমাজে আবশ্যিক বিধি হিসাবে কঠোরভাবে জনপ্রিয় করেন।

সতীদাহের বিবরণ

এবার অতীতের সেই বীভৎস সতীদাহ প্রথার ভয়ংকর দৃশ্য একবার কল্পনা করা যাক । ভাগীরথীর তীরে চিতা সজ্জিত হয়েছে। ঘটনার আগেই সেই সদ্যবিধবাকে ভাঙ্গ ও ধুতরাবীজ খাইয়ে অর্ধ-অচেতন করে দেওয়া হয়েছে। এইরকম বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় সেই হতভাগীকে তার মৃত স্বামীর চিতায় শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হত। অতঃপর দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত আগুন। সেইসঙ্গে চারিদিকে ঢাক-ঢোল-কাঁসর-ঘণ্টার তীব্র শব্দ সৃষ্টি করা হত। যমদূতের মত বলশালী দুই ব্যক্তি প্রকাণ্ড কাঁচা বাঁশ চিতার উপর সর্বশক্তি দিয়ে ধরে থাকত, যাতে সতী কোনভাবেই পালাতে না পারে।

এমন ঘটনাও হয়তো দেখা গিয়েছে যে, জলন্ত চিতায় সতী নেই। আসলে বাঁচার তীব্র আকুতিতে কোনো রমণী হয়ত অর্ধদগ্ধ শরীরে জঙ্গলে আত্মগোপন করত অথবা গঙ্গায় ঝাঁপ দিত। অমনি ক্ষুধার্থ হায়নার মতো সেদিনের ধর্মরক্ষকেরা গভীর জঙ্গল থেকে সেই ভীতসন্তস্ত্র ও অর্ধমৃতা বিধবা রমণীকে জোরজবরদস্তি করে পুনরায় জলন্ত চিতায় তুলে দিত। সেই রমণীর হাজার অনুরোধ-উপরোধ, প্রাণভিক্ষা অথবা বুকফাটা কান্নাও তাদের পাষাণ হৃদয়কে পরিবর্তন করতে পারত না। শেষপর্যন্ত আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখা নারীর শেষ আর্তনাদটুকুও শেষ করে দিত। আগ্রহী বন্ধুরা বিশিষ্ট লেখক তথা বিবেকানন্দের মাস্টারমশাই শিবচন্দ্র বসুর (১৮১৪-১৮৮৮ খ্রিঃ) লেখা 'Hindoos As They Are' গ্রন্থটি (১৮৮১ সালে প্রকাশিত) পড়তে পারেন। এখানে লেখক তাঁর শৈশবে দেখা নিজের কাকিমার সহমরণের হৃদয় বিদারক ঘটনাটির করুণ বর্ণনা দিয়েছেন।

অর্থনৈতিক কারণ

ইতিহাসবিদ রামশরণ শর্মার মতে, সতীদাহ প্রথার ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছিল আদি মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে। কারণ সমকালীন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি এবং নব্যব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান সতীপ্রথাকে জায়মান রাখতে বিপুল অক্সিজেন যুগিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে সতীদাহের মতো কুপ্রথার পিছনে শুধু শাস্ত্রীয় প্রবচন একমাত্র দায়ী ছিল না। এই বর্বর প্রথার রমরমার পিছনে মূল কারণটা ছিল অর্থনৈতিক। এককথায় মৃত স্বামীর সম্পত্তি থেকে তার বিধবা পত্নীকে বঞ্চিত করে সমস্ত অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করা। কারণ মনুসংহিতা থেকে শুরু করে অধিকাংশ ধর্মশাস্ত্রেই নারীকে 'আপন ভাগ্য জয় করিবার' কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি। উপরন্তু নারীকে ভোগ্যবস্তু ও দাসীতে পরিণত করার সর্বপ্রকার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সুতরাং অর্থসম্পত্তিতে বিধবার অধিকারকে পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। এজন্য পি. ভি. কানে, এ. এস. অলটেকার, রোমিলা থাপার, ওয়েন্ডি ডনিগার— প্রত্যেকেই দায়ভাগ আইনকে বাংলায় সহমরণের রমরমার পিছনে সবচেয়ে বেশি দায়ী করেছেন।

এখন প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক যে, তাহলে রাজস্থান বা উত্তর ভারতে সতীপ্রথা রমরমিয়ে চলতো কেন? বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র আর্যাবর্ত বা উত্তর ভারত নয়, দাক্ষিণাত্যেও সতীদাহ প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেখা যাক। পর্তুগিজ পর্যটক ডুয়ার্তে বারবোসার (১৪৮০-১৫২১ খ্রিস্টাব্দ) বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ষোড়শ শতকে বিজয়নগর রাজ্যের এক রাজার মৃত্যু হলে তাঁর চিতায় সহমরণে গিয়েছিলেন অন্তত চারশো থেকে পাঁচশো নারী। ভাবা যায়! আসুন বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত যাক।

দ্বাদশ শতকে জীমূতবাহন রচিত 'দায়ভাগ' আইন

বাংলার হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে সেই সময়ে বাংলা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে যাগ্যবল্কের টীকাকার বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত (১০৭০-১১০০ খ্রি.) 'মিতাক্ষরা' আইন চালু ছিল। এই মিতাক্ষরা আইনে সতীপ্রথাকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো হয়েছিল। শুধু তাই নয়, অঙ্গিরা ও ব্যাসের শাস্ত্রীয় প্রবচনে নারীর বৈধব্য জীবনকে কঠোরভাবে নিন্দা করা হয়েছিল। পক্ষান্তরে স্কন্দপুরাণ ও পদ্মপুরাণে সহমরণ প্রথাকে উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় প্রচলিত দায়ভাগ আইনে বিধবাকে তুলনামূলক বেশি সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এখানে বলা হয়েছিল যে, কেবলমাত্র পৃথগন্ন পরিবারে নয়; যৌথ পরিবারেও অপুত্রক ও মৃত স্বামীর সম্পত্তির অধিকার তার প্রাপ্য। সুতরাং বিধবার অর্থ-সম্পত্তিকে অন্যায়ভাবে হস্তগত করার জন্য এই বর্বরপ্রথার উপর শাস্ত্রীয় প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল অত্যন্ত সুচারুভাবে, যার হিংস্র থাবা থেকে শিশু সন্তানের জননী ও গর্ভবতী নারীদেরও রেহাই পাওয়া সম্ভবপর ছিল না।

রামমোহনের লড়াই

এই আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আমাদের কয়েকটি বিষয় স্মরণে রাখা দরকার। প্রথমত, রামমোহন যখন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন তখন সময়টা ছিল উনিশ শতকের প্রারম্ভ। সেই সময় বাংলা তথা ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীন এবং ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল বাংলার অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি।

দ্বিতীয়ত, রামমোহন মনে করতেন যে, ইংরেজ শাসন বিদেশী শাসন হলেও ভারতবর্ষে তার একটা কল্যাণকর ভূমিকা রয়েছে।

তৃতীয়ত, অসামান্য পাণ্ডিত্য ও বহু অধ্যয়নের অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে ইউরোপীয় দর্শন, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের অলোকসামান্য প্রভাব পড়েছিল, যা সমকালে নিঃসন্দেহে এক আশ্চর্যজনক ঘটনা।

সর্বোপরি, তিনি হিন্দুধর্মের বিরোধী ছিলেন না; বরং ধর্মের নামে যেসমস্ত বর্বর ও কুপ্রথাগুলি হিন্দু ধর্মে ওতোপ্রোতোভাবে যুক্ত হয়েছিল, সেগুলির সুতীব্র বিরোধী ছিলেন।

রামমোহনের সমকাল

রামমোহনের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের মাত্র ১৫ বছর পরে তাঁর জন্ম (১৭৭২ খ্রিঃ)। ইতিমধ্যে বাংলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। পলাশির যুদ্ধ বিজয়ের পরে শুরু হয়েছিল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এদেশ থেকে বেপরোয়া অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন, যার নগ্ন বিবরণ পাওয়া যায় ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত উইলিয়াম বোল্টস-এর 'Consideration on Indian Affair' গ্রন্থে। অতঃপর ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে ইংরেজরা সুবে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে (১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। অর্থাৎ নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর ইংরেজরা পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। ফলে বেপরোয়া লুঠ যেন এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হল, যার পরিণতিতে বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে দেখা দিয়েছিল এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের এই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তৎকালীন সুবে-বাংলার (বর্তমানে দুই বাংলাসহ বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, আসাম ও ত্রিপুরা) প্রায় ১ কোটি মানুষ অনাহারে প্রাণ হারিয়েছিল। এই মন্বন্তরের ভয়ংকর-সুন্দর বর্ণনা দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বহু পঠিত 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে।

ঠিক তার পাশাপাশি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'শাসন রূপী শোষণ'-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ। অন্যদিকে দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও কুসংস্কারের পাশাপাশি জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, কৌলিন্যপ্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, পুরুষের বহুবিবাহ, কন্যাসন্তান বিসর্জন, নরবলি প্রভৃতি অজস্র ভয়ংকর-বর্বর ও অমানবিক কুপ্রথাগুলির বাড়বাড়ন্ত বঙ্গ তথা ভারতীয় সমাজকে তীব্রভাবে কলুষিত করেছিল। সেদিনের সেই ভয়ানক অন্ধকারাচ্ছন্ন ধর্মীয়-সামাজিক পরিবেশকে রবীন্দ্রনাথ চিত্রিত করেছেন এইভাবে—

“...তখন বঙ্গসমাজ সেই প্রেতভূমি ছিল। তখন শ্মশানস্থলে প্রাচীনকালের জীবন্ত হিন্দুধর্মের প্রেতমাত্র রাজত্ব করিতেছিল। তাহার জীবন নাই, অস্তিত্ব নাই, কেবল অনুশাসন ও ভয় আছে মাত্র।”

একটি ঘটনা

এবার সতীদাহ প্রথা নিবারণে তিনি ঠিক কী করেছিলেন সেটা দেখা যাক। রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি ছিল এইরকম—

কলকাতার বিত্তবান মল্লিক পরিবারের এক বিধবা রমণী সহমৃতা হবার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। চিতা তখন প্রস্তুত। পরিবারের মানুষেরাও এমন পূণ্যকর্মের সাক্ষী হতে পেরে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। ঠিক তখনই ঘটল এক অঘটন। স্বয়ং রামমোহন তৎক্ষণাৎ সেই শ্মশানে উপস্থিত হলেন এবং সেই বিধবা রমণীকে সহমরণে নিবৃত্ত করার সর্বপ্রকার চেষ্টা করলেন। গঙ্গাতীরে তখন বহু মানুষ জমে গিয়েছে। কারণ তৎকালীন শিক্ষিত ও সাধারণ মহলে এই দীর্ঘদেহী মানুষটির নামযশ যথেষ্ট সুপরিচিত। তিনি সেই সদ্য বিধবা রমণীকে সহমরণ অপেক্ষা আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করা অধিকতর শ্রেয়—একথা বোঝাতে লাগলেন। কিন্তু পরিবারের মানুষজন রামমোহনের এমন মহৎ কাজে অধৈর্য ও ক্ষুব্ধ হল এবং একজন ক্রোধান্ধ হয়ে চিৎকার করে বললো— ‘হিন্দুর কার্যে মুসলমান কেন?’ প্রভুর এমন অপমানে রামমোহনের ভৃত্য রেগে গেলেও তিনি তাকে শান্ত ও সংযত থাকতে বলেছিলেন।

মল্লিক পরিবারের এই ঘটনাটিকে অনেকে ‘কাহিনি’ বলে উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে কালীঘাটে কয়েকজন নারীর সহমৃতা হবার ঘটনা শুনে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েও তাদের নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু মানুষটি ছিলেন রামমোহন! কোনভাবেই হতোদ্যম হননি। শতসহস্র ব্যর্থতা তাঁকে যেন অধিকতর দৃঢ় সংকল্পী করে তুলেছিল।

সংগ্রামের উৎস

এখন প্রশ্ন হল রামমোহন কেন সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে এমন জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন? অনেকের মতে, ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহনের মৃত্যুতে বৌদি অলকমণি বা অলোকামঞ্জরীর সহমরণের ঘটনাটি তাঁর হৃদয়ে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। রামমোহন তখন ছিলেন রংপুরে। তাঁর জননী নাকি এতোটাই পুত্রশোকাতুরা ছিলেন যে, পুত্রবধূকে সহমরণে নিবৃত্ত করার কোনোরকম প্রচেষ্টা তিনি করেননি। এই ঘটনায় রামমোহন তাঁর জননীর প্রতি রীতিমতো বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে ভিন্নমতও রয়েছে। গবেষক স্বপন বসুর মতে, রায় পরিবারে সতীদাহপ্রথার ঐতিহ্য ছিল না। আসলে সতীদাহের বিরোধিতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই তৎকালীন সময়ে রামমোহনের কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে অজস্র প্রচলিত ঘটনার ঘনঘটা অথবা কিংবদন্তী এসে পড়বেই। কারণ এই মানুষটি সমকালীন সময়ে বিভিন্ন সভা-সমিতি করে, বাংলা ও ইংরেজিতে পুস্তিকা লিখে, সংবাদপত্রের (বাঙ্গাল গেজেটি ও সংবাদ কৌমুদী) পৃষ্ঠায় আন্দোলন করে, রাজদরবার ও প্রশাসনিকস্তরে আবেদন করে এবং সর্বোপরি নিজ মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে শ্মশানে-শ্মশানে নিরলস ছুটেবেড়িয়ে আত্মহননে ইচ্ছুক বিধবাদের নিবৃত্ত করার পাশাপাশি, সহমরণের মতো অমানবিক ও নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির কাজে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন।

আমাদের ধারণা, গভীর ও নিরলস অধ্যয়ন, ইউরোপীয়দের সঙ্গে মতবিনিময়, নারীদের প্রতি সহমর্মিতা এবং অবশ্যই যুক্তিবাদী চিন্তাধারা রামমোহনকে সমকালীন গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির বিপ্রতীপে পরিচালিত করেছিল। তাঁর মননে যুক্তিবাদী দর্শন গড়ে উঠার নেপথ্যে চালিকাশক্তির কাজ করেছিল ইসলামীয় সূত্র, মুতাজিলা ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শন। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, রামমোহনের আগেও সতীদাহের বিরোধিতা হয়েছে। কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম এই সুপ্রাচীন ও বর্বর প্রথার বিরুদ্ধে দেশবাসীর চেতনা সঞ্চার করে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

বিরোধিতার ইতিহাস

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে দেখি যে, সপ্তম শতাব্দীতে 'কাদম্বরী' কাব্যে সম্রাট হর্ষবর্ধনের (৬০৬-৬৪৭ খ্রিঃ) সভাকবি বাণভট্ট সহমরণের বিরোধিতা করেন। মধ্যযুগে সতীদাহের বিরুদ্ধে প্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রিঃ)। মুঘল সম্রাটদের মধ্যে হুমায়ুন সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে সক্রিয় হয়েছিলেন। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রিঃ) বলপ্রয়োগের মাধ্যমে সতীদাহের বিরোধিতা করেন। মালদেবের পুত্র উদয়সিংহের কন্যার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে সতী করার সংবাদ শুনে স্বয়ং আকবর অশ্বপৃষ্ঠে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে শ্মশানে উপস্থিত হন এবং মেয়েটির জীবন রক্ষা করেছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান পূর্বপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কঠোর পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ঔরঙ্গজের কাশ্মীর থেকে রাজধানী দিল্লিতে ফিরে এসে সতীদাহ বন্ধ করার এক রাজকীয় ফরমান জারি করেন :

"...in all lands under Moghul Empire of my control, never again should be the officials of my Government allow a woman to be burnt..." (ইতালির পর্যটক মনুচ্চির লেখায়)।

সেই আদেশ সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী না হলেও প্রাদেশিক শাসকদের সতর্কতায় সেদিন বহু রমণীর প্রাণ রক্ষা পেয়েছিল।

ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির ভূমিকা

১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারী সর্বপ্রথম সতীদাহ প্রথার বিরোধিতা শুরু করেছিল। তবে প্রশাসন সামগ্রিকভাবে উদাসীন ছিল। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে প্রখ্যাত পণ্ডিত উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে শ্রীরামপুর মিশনারীরা সতীদাহ সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৎকালীন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মিস্টার উডনির কাছে পেশ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেদিন কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। তা সত্ত্বেও ক্যালকাটা গেজেট, ক্যালকাটা জার্নাল, বেঙ্গল হরকরা, বেঙ্গল ক্রনিকল, ইন্ডিয়া গেজেট, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ পত্রিকাগুলি সতীদাহের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। শেষ পর্যন্ত কোম্পানি রাজের পক্ষে চোখ বুঁজে থাকা আর সম্ভব ছিল না। সরকারীভাবে ১৮১২, ১৮১৫ ও ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহের উপর কিছু বিধিনিষেধ প্রবর্তিত হয়েছিল, যার মূল বক্তব্য ছিল—বিধবা নারীদের জবরদস্তিমূলক দাহ নিষিদ্ধ হয় এবং অনুমরণ প্রথা বন্ধ করা হয়। কিন্তু তবুও নারী হত্যার লেলিহান চিতার আগুন কোনভাবেই নিভলো না। এ প্রসংগে বাংলাসহ, পাটনা, কাশী, বেরিলি প্রভৃতি অঞ্চলে সতীদাহের সংখ্যাটা ছিল রীতিমতো মারাত্মক ও ভয়ানক :

১৮১৭ খ্রিঃ—০৭ জন, ১৮১৮ খ্রিঃ—৮৩৯ জন, ১৮১৯ খ্রিঃ—৬৫০ জন, ১৮২০ খ্রিঃ—৫৯৭ জন, ১৮২১ খ্রিঃ— ৬৫৪ জন, ১৮২২ খ্রিঃ— ৫৮৩জন, ১৮২৩ খ্রিঃ— ৫৭৫ জন, ১৮২৪ খ্রিঃ— ৫৭২ জন, ১৮২৫ খ্রিঃ— ৬৩৯ জন, ১৮২৬ খ্রিঃ— ৫১৮ জন, ১৮২৭ খ্রিঃ— ৫১৭ জন, ১৮২৮ খ্রিঃ— ৪৬৩ জন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের বক্তব্য

সময়টা ছিল ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দ। ঔপনিবেশিক শিক্ষার ইতিহাসে সময়টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। সেই বছর কলকাতায় হিন্দু কলেজ (বর্তমানে প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হল। পাশাপাশি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক ও সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (আনু. ১৭৬২-১৮১৯ খ্রিঃ)। একদিন কলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতের প্রধান বিচারপতি সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত কিনা জানতে চেয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে পণ্ডিতমশাই দ্বিধাহীনভাবে ব্যক্ত করেন যে, সতীদাহ প্রথার পিছনে কোনোরকম শাস্ত্রীয় সমর্থন নেই। নারীর পক্ষে এইভাবে জলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দেওয়া একেবারেই অনুচিত কর্ম। বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে জীবনযাপনই অধিকতর শ্রেয়। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের এমন নির্ভীক ও উদার বক্তব্যে রামমোহনের মনোবল বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই

প্রেক্ষিতে সতীদাহের মতো বর্বর প্রথা সম্পর্কে শাস্ত্রে কী লিপিবদ্ধ রয়েছে, সেটা সাধারণ মানুষকে অবগত করার উদ্দেশ্যে রামমোহন স্বয়ং কলম ধরলেন। সেই বছরেই অসহায় বিধবা নারীদের মৃত স্বামীর জলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারাকে 'অশাস্ত্রীয়' বলে ছাপার অক্ষরে ধিক্কার জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন— 'A Second Defence of the Monotheistical System of the Vedas' নামক গ্রন্থ।

রামমোহনের লড়াই

১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে সতীদাহের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম বাংলা বই 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' প্রকাশিত হলো। নিজ ব্যয়ে হাজার কপি ছাপিয়ে কলকাতার সর্বত্র বিনামূল্যে তিনি বিলি করেন। এই গ্রন্থে ছিল দুটি চরিত্র—প্রথমজন প্রবর্ত্তক (সতীদাহ প্রথার পক্ষপাতী) এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন নিবর্ত্তক (সহমরণের বিপক্ষে)। সর্বমোট ২২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি সেসময়ে যে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল, সেকথা এশিয়াটিক জার্নাল অস্বীকার করেনি। অল্পদিনের মধ্যেই পুস্তিকাটির ইংরেজি অনুবাদ সারস্বত সমাজকে বৃহৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখোমুখি দাঁড় করেছিল। মনে রাখা দরকার, সমকালীন সময়ে একজন উচ্চবর্ণের হিন্দু ভারতীয় উপমহাদেশে সতীদাহের মতো সহস্রাধিক বছরের পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছেন, এটা ছিল অকল্পনীয় ঘটনা। অন্যদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের অন্যতম প্রতিনিধি কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ রামমোহনের বিরোধিতায় 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' রচনা করেন।

প্রত্যুত্তরে রামমোহন 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' প্রকাশ করেন। কাশীনাথের প্রতিক্রিয়াশীল বক্তব্যকে তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করে তিনি লিখেছিলেন—'স্ত্রীবধ, ব্রহ্মবধ, পিতৃহত্যা, মাতৃহত্যা প্রভৃতি দারুণ পাতকসকল দেশাচারবলেতে ধর্ম্মরূপে গণ্য হইতে পারে না'। এমনকি প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ হোরেস হাইমেন উইলসন সতীদাহকে শাস্ত্রসম্মত আখ্যা দিলে, রামমোহন সতীদাহের বিরুদ্ধে শাস্ত্র থেকেই যুক্তি দিয়ে উইলসনের ভ্রান্ত ধারণা ভেঙে দেন। শুধু তাই নয়, তাঁর আপসহীন ধর্মযুদ্ধের বার্তা পৌঁছে গিয়েছিল সুদূর লন্ডনে। ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে (২১ ও ২৮ মার্চ) কোম্পানির পরিচালকদের লন্ডনের এক সভায় জন পয়েন্ডার বলেছিলেন :

"That intelligent native (although born and educated a Brahmin) has brought before the Indian public, for the purpose of showing that it treats the practice of Suttee as fatal error in Religion and involving the violation of every humane and social feeling."

(ভাবানুবাদ : সেই বুদ্ধিমান ভারতীয় (যদিও তিনি একজন ব্রাহ্মণ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং শিক্ষিত হয়েছেন) জনসাধারণের সামনে বিষয়টি তুলে ধরেছেন, যাতে দেখানো যায় যে তারা সতীদাহ প্রথাকে ধর্মের মারাত্মক ভুল এবং প্রতিটি মানবিক ও সামাজিক অনুভূতির লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে।)

দিলীপকুমার বিশ্বাসের গবেষণা থেকে জানা যায় যে, সতীদাহের বিরোধিতায় ১৮১৮ থেকে ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় তিনটি এবং ইংরেজিতে চারটি (শেষ গ্রন্থটি ইংল্যান্ডে প্রকাশিত) অর্থাৎ সর্বমোট সাতটি গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

সতীদাহ রদ

এরপর এলো ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। সময়টা ছিল ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস। কলকাতার গভর্নর হাউসে দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব মুখোমুখি হয়েছেন, একজন বাংলার ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক আর অন্যজন ছিলেন সতীদাহ বিরোধী সংগ্রামের অবিসংবাদিত নায়ক রামমোহন। উভয়েই চিন্তামগ্ন। না, সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নে রামমোহন কোনোরকম অভিমত দিতে পারলেন না। কারণ তাঁর মতে, শান্তভাবে, বলপ্রয়োগ না করে, আরও বিধিনিষেধ বাড়িয়ে পুলিশের সাহায্যে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি না করে এই নৃশংস প্রথাটিকে দমন করা যেতে পারে।

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক

এছাড়াও তিনি এইমর্মে আরও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে, কোনো আইন প্রণয়ন হলে জনগণের মধ্যে এই আশঙ্কার জন্ম দেবে—একছত্র ক্ষমতা পেয়ে ইংরেজরা পূর্ববর্তী মুসলিম শাসকদের মতো তাদের নিজস্ব ধর্ম আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে চায়। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, শাস্ত্রীয় অনুমোদন না থাকা সত্ত্বেও সতীদাহের মতো অমানবিক প্রথার ঐতিহ্য যেভাবে হিন্দুসমাজে গভীরভাবে বদ্ধমূল ছিল, তাকে আইনের মাধ্যমে রাতারাতি রদ করলে হয়তো সমাজে প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে। ফলস্বরূপ আইন প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্যটাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। সমকালীন প্রেক্ষাপটে বিচার করলে দেখা যাবে যে, রামমোহনের এই আশঙ্কার মধ্যে খুব ভুল ছিল না।

অন্যদিকে একদা বেন্টিংক যে রামমোহনকে "a warm advocate for the abolition for the suttee" অভিধায় ভূষিত করেছিলেন, সেই অকুতোভয় রামমোহনের কণ্ঠে এমন অভিমত গভর্নর জেনারেল প্রত্যাশা করেননি। শেষ পর্যন্ত সর্বপ্রকার সংশয় ঝেড়ে ফেলে, বেন্টিংক ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর ১৭ নম্বর রেগুলেশনের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের প্রচলিত নৃশংস সতীদাহ প্রথাকে আইনত নিষিদ্ধ করেন। এই আইনে সতীদাহকে জরিমানা ও কারাবাসের যোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত করা হল। নারীকে জোরজবরদস্তি করে সতীদাহ করলে উদ্যোক্তাদের হত্যাপরাধী হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য বলে ঘোষণা করা হল।

অন্যদিকে আইন পাশ হবার পরেই সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ থেকে (প্রায় ৩০০ জন মানুষের সমাবেশে) বেন্টিংককে প্রকাশ্যে অভিনন্দন জানালেন রামমোহন। ভারতবন্ধু ডেভিড হেয়ার থেকে শুরু করে হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক ডিরোজিও সহ বহু গণ্যমান্য মানুষ সেদিন উপস্থিত ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন সময়ে সতীদাহপ্রথা উচ্ছেদ করা যে অত্যাবশ্যক কর্ম—এবিষয়ে দুজনেই ছিলেন একমত। শুধু বেন্টিংকের সঙ্গে তাঁর ভাবনার পার্থক্যটা ছিল মূলত পদ্ধতিগত। আগ্রহী পাঠক এ প্রসংগে বিস্তারিত আলোচনা পাবেন স্বপন বসুর সুপ্রসিদ্ধ 'সতী' গ্রন্থে। লেখক দাবি করেছেন—"সতীপ্রথার উচ্ছেদ ছিল রামমোহনের জীবনের স্বপ্ন। কিন্তু তিনি উগ্রপন্থায় বিশ্বাস করতেন না। আইন করে রাতারাতি সামাজিক পরিবর্তন আনতে তিনি চাননি। জীবনের মতো সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেও তিনি ধীরে চলো নীতির পক্ষপাতী।"

সমকালে প্রতিক্রিয়া

এই ঘটনার দুই ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছিল তৎকালীন সমাজে। আইন প্রকাশিত হবার পরেই খ্রিস্টান মিশনারীরা, সমস্ত ইংরেজি সংবাদপত্র, ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ, এমনকি কলকাতার মহিলারাও বেন্টিংককে অভিনন্দিত করেছিলেন। অন্যদিকে দেশীয় সমাজপতিরা বিষয়টিকে ধর্মহানির চক্রান্ত মনে করে গভীর শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি অর্থাৎ রামমোহন কর্তৃক বেন্টিংককে অভিনন্দন জ্ঞাপনের পরের দিন, রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে এই জড়তাগ্রস্ত রক্ষণশীল গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা, যাদের পোষাকী নাম ছিল 'ধর্মসভা', তারা সতীদাহের পক্ষে ১১৪৬ জনের স্বাক্ষর (মতান্তরে ১২৯৪ জনের

স্বাক্ষরিত) সম্বলিত আর্জি সরকারের কাছে পেশ করেন। তারা বড়লাটকে একটি পত্রে এইমর্মে লিখেছিলেন :

"Some blasphemous persons, whose minds are infected with atheism, misinterpret the meaning of the text of several intelligent sages through their incompetence to understand the genuine construction of the Law."

(ভাবানুবাদ : কতিপয় ঈশ্বরনিন্দুক ব্যক্তি, যাদের মন নাস্তিকতায় দূষিত, আইনের প্রকৃত গঠন বুঝতে তারা অক্ষমতার মাধ্যমে প্রাজ্ঞ ঋষিদের লেখার ভুল ব্যাখ্যা করে।)

ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ ও ঘৃণাভরে চয়ন করা উপরোক্ত শব্দগুলির লক্ষ্য যে ছিলেন রামমোহন, সে কথা বলাই বাহুল্য। শুধু তাই নয়, তাঁর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল গোষ্ঠীরা গুপ্তঘাতকও নিযুক্ত করতে পিছপা হননি, তার প্রমাণ মেলে ইংল্যান্ডের John Bull নামক একটি সাময়িকপত্রে। শেষ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের তরফ থেকে এই আবেদন প্রত্যাখ্যাত হলে 'ধর্মসভা'-র সদস্যরা সতীদাহ নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলে আবেদনের সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর ইংল্যান্ডে যাবে কে? সমকালীন সময়ে হিন্দুদের তো সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ। ঠিক সেই সময় এগিয়ে এলেন একজন ব্রিটিশ। তাঁর নাম ছিল মিস্টার ফ্রান্সিস বেথি, যিনি কলকাতা সুপ্রিম কোর্টের স্বনামধন্য এটর্নি ছিলেন। তিনি 'মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা' পেলেই সব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। মনে রাখা দরকার, আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে ৫০,০০০ টাকার মূল্য ছিল বহুগুণ। কিন্তু সমকালীন যুগে রক্ষণশীল ধর্মসভার দল এতে প্রবল উচ্ছ্বসিত হয়েছিল।

অন্যদিকে দিল্লির মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় আকবরের দৌত্যকার্যের জন্য নিযুক্ত একজন ভারতীয় ইংল্যান্ডে যাবার সংকল্প নিলে তৎকালীন কতিপয় শিক্ষিত মানুষ তাঁকে যাত্রাপথের খরচ হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা দিতে মনস্থ করেন। কিন্তু যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এক বর্বর প্রথার হিংস্র থাবা থেকে এদেশীয় নারীদের জীবনরক্ষার মহতী কাজের জন্য কোনরকম অর্থসাহায্য গ্রহণ করতে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি সম্পূর্ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেছিলেন—"সতীদাহপ্রথার বিলুপ্তি দেখতে পেলে তিনি যার পর নাই আনন্দিত হবেন।"

হ্যাঁ, সেদিনের এই অকুতভয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী মানুষটিই ছিলেন রামমোহন।

তারপর কী হয়েছিল?

মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে যে, তারপর কী হয়েছিল? বস্তুতপক্ষে রামমোহনের সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ সংগ্রামের শেষপর্বের পটভূমি ছিল সুদূর ইংল্যান্ড। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ৮ এপ্রিল, অ্যালবিয়ান জাহাজে ৪ মাস ২৩ দিনের সুদীর্ঘ সমুদ্রযাত্রা অতিক্রম করে তিনি ইংল্যান্ডের লিভারপুলে পদার্পণ করেন। তারপর কালবিলম্ব না করেই দ্রুত পাড়ি দেন লন্ডনের উদ্দেশে। কারণ ইতিপূর্বেই রক্ষণশীল ধর্মসভার প্রতিনিধি ফ্রান্সিস বেথি প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধকরণের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন। তবে ইংল্যান্ডের বিদ্বৎসমাজে সেইসময় রামমোহন অপরিচিত ছিলেন না। কারণ তাঁর একেশ্বরবাদী মতামত এবং সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রাম ইতিমধ্যেই তাঁকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বিখ্যাত উপযোগবাদী দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২ খ্রিঃ) এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবহীন সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশে তিনি হতোদ্যম হননি; বরং সতীদাহের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডে জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টায় তিনি "A pamphlet containing some remarks in vindication of resolution by the Government of Bengal in 1-29 abolishing the practice of female sacrifice in India" নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বস্তুতপক্ষে মাতৃভূমি থেকে হাজার-হাজার মাইল দূরের সমুদ্রবেষ্টিত ভূখণ্ডে তিনি ছিলেন আপসহীন একক যোদ্ধা। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুন, ২ জুলাই ও ৯ জুলাই—এই তিন দিন প্রিভি কাউন্সিলে সতীদাহপ্রথার ভবিষ্যৎ নিয়ে শুনানী চলেছিল। প্রতিটি দিনই অতন্দ্র

প্রহরীর মতো জাগরূক ছিলেন তিনি।

শেষপর্যন্ত ১১ জুলাই প্রিভি কাউন্সিল, রক্ষণশীলদের (ধর্মসভার সদস্যগণ) আপিলকে পুরোপুরি বর্জন করে উদারপন্থীদের পক্ষেই রায় দিয়েছিল। অর্থাৎ সমকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসিত বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিতে সতীদাহপ্রথা পুনরায় চির-নিষিদ্ধ বলে ঘোষিত হল। যে মুহূর্তে বিচারের জয়ধ্বনি ঘোষিত হল, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে সতীদাহ নিষিদ্ধকরণের অবিসংবাদিত নায়ক রামমোহন সেখানে উপস্থিত। সত্যিই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম 'স্মরণীয় মুহূর্ত এটি'—সেটা বলার কোনো অপেক্ষা রাখে না।

উল্লেখ্য যে, প্রিভি কাউন্সিলের দশজন সদস্যের মধ্যে ছয়জনই সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধকরণের পক্ষে সমর্থন করেন। শুধু তাই নয়, প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যরা এখানেই থেমে থাকেননি; সতীদাহ নিবারণ-বিরোধী আর্জি খারিজ করতে তারা সমকালীন ইংল্যান্ডের সম্রাট উইলিয়াম চতুর্থকেও (১৮৩০-১৮৩৭ খ্রিঃ) সুপরামর্শ দেন।

এদিকে রক্ষণশীল ধর্মসভার সদস্যরা শোকে মুহ্যমান হলেও তাদের মুখপাত্র ফ্রান্সিস বেথি হাল ছাড়েননি। কারণ এতে বেথির অর্থ প্রাপ্তির স্বার্থ ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল। এমতাবস্থায় তার শেষ রাস্তা ছিল সম্রাটের হস্তক্ষেপের জন্য তদবির-তদারকি করা। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি তিনি সম্রাটের কাছে প্রিভি কাউন্সিলের রায়ের পুনর্বিবেচনার আর্জি জানান। কিন্তু সে পথও বন্ধ হল চিরতরে। কারণ স্বয়ং উইলিয়াম চতুর্থ সেই আর্জিও পুরোপুরি খারিজ করে দেন।

এই ঘটনার গভীর প্রভাব পড়েছিল ভারতবর্ষে। একে একে ব্রিটিশ আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলিতেও সতীদাহ নিষিদ্ধকরণ আইনিভাবে বলবৎ হতে শুরু হয়। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে জয়পুরে সতীদাহপ্রথা নিষিদ্ধ হয়। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে জয়সলমীর, হায়দরাবাদ, গোয়ালিয়র, প্রতাপগড়, ইন্দোর, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যে সতীপ্রথা বেআইনি হিসাবে ঘোষিত হয়। ১৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে দেশীয় মুসলিম রাজ্যগুলিতেও সতীদাহের অবসান ঘটে। ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র রাজস্থানে

বধূবেশে রূপ কানোয়ার

সতীপ্রথার পরিসমাপ্তি হয়।

স্বাধীন ভারতে রূপ কানোয়ারের মর্মান্তিক মৃত্যু ছিল সতীদাহের অন্তিম দৃষ্টান্ত। শেষপর্যন্ত প্রবল জনরোষের চাপে তৎকালীন ভারত সরকার নতুন কঠোর আইন জারি করে এই মধ্যযুগীয় বর্বর প্রথার কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, রূপ কানোয়ারের হত্যাকারীদের মধ্যে অধিকাংশই উপযুক্ত প্রমাণাভাবে গতবছর খালাস পেয়ে যায়।

সুতরাং, রামমোহনের অপ্রতিরোধ্য সংগ্রামের প্রাসঙ্গিকতা যে আজও শেষ হয়নি—সেটা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায়।

ঋণস্বীকার

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৪২২ বঙ্গাব্দ
২. সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজা রামমোহন রায়, তথ্য ও বেতার মন্ত্রক, ভারত সরকার, ১৯৭৭ সাল
৩. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, দে'জ পাবলিশিং, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
৪. স্বপন বসু, সতী, পুস্তক বিপনি, ২০২০ সাল
৫. দিলীপকুমার বিশ্বাস, রামমোহন সমীক্ষা, সারস্বত, ১৯৯৪ সাল
৬. বিনয়ভূষণ রায়, বাংলায় সতীদাহ : সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যায়ন, সাহিত্যশ্রী, ১৯৮৬ সাল
৭. সুব্রতা সেন, সতীদাহ ও পণপ্রথা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৬ সাল
৮. গোরাচাঁদ মিত্র, সতীদাহ, শঙ্খ প্রকাশন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ
৯. সন্দীপন সেন সম্পাদিত, রামমোহন ২৫০ স্মারকগ্রন্থ, রামমোহন লাইব্রেরি অ্যান্ড ফ্রি রিডিং রুম, ২০২২ সাল
১০. পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত, পশ্চিমবঙ্গ : রামমোহন সংখ্যা, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

১১. রমেনকুমার সর সম্পাদিত, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা : রামমোহন রায় বিশেষ সংখ্যা, ১৩০ বর্ষ ৪ সংখ্যা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ২০২৪ সাল
১২. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, নবজাগরণের সূচনাপুরুষ রামমোহন রায়, পরম্পরা প্রকাশন, ২০২৪ সাল
১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, বিশ্বভারতী, ১৯৬৫ সাল
১৪. গৌতম নিয়োগী সম্পাদিত, রামমোহন চর্চা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২০১৮ সাল
১৫. শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার), দেবদাসী, দেজ পাবলিশিং, ২০২০ সাল
১৬. রামশরণ শর্মা, প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৯৭ সাল
১৭. সৌরভরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, সংবর্তক বিশেষ সংখ্যা : রামমোহন রায়, বিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০২৪ সাল
১৮. তাপস ভৌমিক সম্পাদিত, সার্ধ-দ্বিশতবর্ষে রামমোহন রায়, কোরক, ২০২২ সাল
১৯. John S. Hawley– Sati - The burning of wives in India– Oxford– 1994
২০. John Poynder, Human Sacrifices in India, London–1827
২১. A. L. Basham, The Wonder that was India, Picador.
২২. Dr. Kalidas Nag & Debajyoti Burman Edited, The English Works of Raja Rammohan Ray– Vol. 1-7– Sadharan Brahmosamaj, Calcutta– 1995
২৩. রূপ কানোয়ার-এর বিষয়ে জানতে হলে গুগল সার্চের মাধ্যমে সাম্প্রতিকতম বিচারের দুর্ভাগ্যজনক রায়ও দেখতে পাওয়া যাবে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
সুভাষ পাণ্ডে (জিয়াগঞ্জ), বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত ‘চোখ’ পত্রিকা, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত শিবাশীষ বসুর একটি প্রবন্ধ এবং বইপত্র ও পত্রিকা দিয়ে সাহায্য করেছেন সুদীপ্ত দত্ত।

ভূপেন হাজারিকা : সুরের নদীতে মানুষ-ভাসানো এক বাঙালি

আবু তাহের মাসুম রাজা
(প্রবেশবর্ষ ১৯৯৬)

"আমি এক যাযাবর।
আমি এক যাযাবর।
পৃথিবী আমাকে আপন করেছে,
ভুলেছি নিজের ঘর।"

এই কথাগুলো যেন কেবল কিছু শব্দ নয়; এ এক অন্তর্গত জীবনদর্শন। একজন শিল্পীর নিজের সত্ত্বার এমন আত্মঘোষণা খুব কমই শোনা যায়। ভূপেন হাজারিকার কণ্ঠ এমনই ছিল, যা নিঃশব্দেও উচ্চারিত হত, গভীর রাতের একাকিত্বে বা হাজারো মানুষের জনারণ্যে। সেই কণ্ঠ ছুঁয়ে যেত হৃদয়ের ভেতরকার দরজা।

আজ, ২০২৫ সালে, তাঁর জন্মের শতবর্ষে আমরা তাঁকে যখন স্মরণ করি, তখন তা কেবল একজন গায়ক, সুরকার বা কবিকে স্মরণ করা নয়; বরং এক পরিপূর্ণ মানুষকে মনে রাখা, যিনি সুরে গড়েছিলেন সমাজ, যিনি কণ্ঠে তুলেছিলেন আত্মার ডাক।

যেখান থেকে শুরু; এক বাঙালির বিশ্বযাত্রা

ভূপেন হাজারিকার জন্ম ১৯২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর, আসামের সদিয়া শহরে। তাঁর বাবার নাম নীলকান্ত হাজারিকা ও মায়ের নাম শান্তিপ্রভা। পরিবারটি ছিল সংস্কৃতিমনস্ক, সংগীতপ্রেমী। ছোটবেলা থেকেই ভূপেনের মধ্যে সুর ও ছন্দের বীজ বপন হয়। তাঁর মাতৃভাষা ছিল অসমিয়া। কিন্তু শৈশবে ব্রহ্মপুত্র নদীর পাশে দাঁড়িয়ে যে ভাষা তিনি অনুভব করেছিলেন, তা ছিল 'মানবতার ভাষা'। সেই নদী তাঁকে শেখায়; জীবন যেমন বহমান, তেমনি অনুভবের ধারাও থেমে থাকে না। তিনি ব্রহ্মপুত্রকে বলতেন 'জলজ সঙ্গী'; সেই নদীর ঢেউয়ের মধ্য দিয়েই তিনি শুনতেন মানুষের কণ্ঠ, দেখতেন মানুষের কান্না, আর ঠিক সেইখান থেকেই গড়ে উঠত তাঁর সুরের ভিত।

"বিস্তীর্ণ দুপারের, অসংখ্য মানুষের—
হাহাকার শুনেও,
নিঃশব্দে নীরবে-ও গঙ্গা তুমি—
গঙ্গা বইছ কেন?"

মানবতাকে উদ্দেশ্য করে তোলা এ এক নিঃশব্দ প্রতিবাদ।

পাঠাভ্যাস ও পাড়ার বাইরের জগত

ভূপেন হাজারিকার শিক্ষাজীবন শুরু হয় গুয়াহাটিতে। এরপর তিনি যান বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। তবে তাঁর জীবনগাথায় অন্যতম এক অধ্যায় যুক্ত হয়, যখন তিনি ফেলোশিপ নিয়ে যান আমেরিকার কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে তিনি শুধু পি.এইচ.ডি. করেননি, শিখেছিলেন বিশ্বসংস্কৃতির এক নতুন পরিসর। হলিউডের সিনেমা, আফ্রিকান-আমেরিকান ব্লুজ, মার্কিন আন্দোলনের সংগীত; সব কিছুই তাঁর ভাবনার গভীরতাকে বিস্তৃত করেছিল। এই বিশ্বমানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে এনে দিয়েছিল এক বিস্তীর্ণ দর্শন, যা ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল পৃথিবীর অন্য প্রান্তের সংবেদনাকে।

গান, যা কেবল গান নয়; মানবজাগরণের দলিল

ভূপেন হাজারিকার গানকে কেবল সঙ্গীতের বিভাগে ফেললে ভুল হবে। তাঁর গান ছিল মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র ও সময়ের মুখপত্র। তাঁর গানে ছিল প্রেম, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ছিল প্রতিবাদ। তাঁর সুরে ছিল শোক, কিন্তু তার গভীরে ছিল প্রতিবাদের নিরবধি মন্ত্র।

"মানুষ মানুষের জন্য"; আজও প্রতিটি মিছিল, প্রতিটি প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়।

"আমি এক যাযাবর"; একজন শিল্পীর আত্মদর্শনের প্রতিচ্ছবি।

"ও গঙ্গা বইছো কেন?"; একটি প্রাচীন নদীর মত সভ্যতার বিকাশ ও পতনের প্রশ্ন।

"জীবনের গান গাইতে জানি, দুঃখের সুর বাজাতে পারি"; এমন আত্মবীক্ষণ কেবল মহৎ শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।

তিনি গেয়েছেন রক্তাক্ত বিভাজনের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে হিংসার বিরুদ্ধে, ভাষার নামে বিভেদের বিরুদ্ধে। তাঁর গান ছিল রক্তমাংসের প্রতিবাদপত্র; যেখানে সুর ও কবিতা এক হয়ে জীবনের কথাই বলে গেছে।

ভাষা, পরিচয় ও মানুষের সেতুবন্ধন ভূপেন হাজারিকা নিজের সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকেননি। তিনি ছিলেন সত্যিকারের বিশ্বনাগরিক। অসমিয়া ভাষায় গান গাওয়ার পাশাপাশি তিনি গেয়েছেন বাংলায়, হিন্দিতে, এমনকি বিভিন্ন আদিবাসী ভাষাতেও। তাঁর গান কখনো অঞ্চলভিত্তিক হয়নি, তা হয়ে উঠেছে সর্বজনীন মানবতার রসায়ন। তিনি বিশ্বাস করতেন; "মানুষের মধ্যে যদি ভেদরেখা টেনে দেওয়া হয়, তবে সেই সমাজ ধ্বংসের দিকে এগোয়।" তাঁর কণ্ঠে ছিল রবীন্দ্রচেতনার শিল্পরুচি, নজরুলের মতো সুরে বিপ্লবের আগুন,আর ছিল এক অতল আত্মবিশ্বাস; যা তাঁকে সাধারণ মানুষ থেকে অসাধারণ করে তুলেছিল।

চলচ্চিত্র, কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির বিস্তার

ভূপেন হাজারিকার প্রতিভার বিস্তার সীমাহীন। তিনি ছিলেন গায়ক, সুরকার, গীতিকার, চিত্রপরিচালক, চিত্রনাট্যকার এবং কবি। তিনি পঞ্চাশটির বেশি চলচ্চিত্রে গান গেয়েছেন, অনেকগুলো নিজে পরিচালনাও করেছেন। তাঁর সিনেমাগুলিতে উঠে এসেছে দলিত, মেহনতি, পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনের কথা। তাঁর কবিতার প্রতিটি পঙক্তিই যেন অপেক্ষা করে সুরে বাঁধার; আর সেই সুরে উঠে আসে এক এমন ভাষা, যা কান দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে শোনা যায়।

"মানুষ মানুষের জন্যে,
জীবন জীবনের জন্যে।"

এইরকম শব্দে তিনি মাটির গন্ধকেও করে তুলতেন মহৎ।

সম্মান ও পুরস্কার

সম্মান তো ছিলই, কিন্তু তিনি ছিলেন তার ঊর্ধ্বে। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, দাদা সাহেব ফালকে পুরস্কার, পদ্মবিভূষণ (মরণোত্তর), ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মানবতা পুরস্কার, অসম বাংলা ও ভারতের নানা প্রান্তের অসংখ্য সম্মাননাপত্র তিনি পেয়েছেন। তবুও তিনি সবসময় বলতেন— "আমি কেবল একজন মানুষ, যে মানুষের হয়ে গাই।"

এই বিনয়, এই অন্তর্নিহিত মহত্ত্বই তাঁকে করে

তোলে এক ব্যতিক্রমী স্রষ্টা।

জন্মশতবর্ষে কেন ভূপেন হাজারিকা?

আজকের পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে সংঘাত, হিংসা, বৈষম্য ও বঞ্চনার কঠিন প্রেক্ষাপটে। যেখানে ধর্ম নিয়ে রাজনীতি, ভাষা নিয়ে বিদ্বেষ, প্রযুক্তির জগতে নিঃসঙ্গতা; ঠিক এমন সময়ই প্রয়োজন এমন এক কণ্ঠ,যার সুরে আছে বিশ্বাস, প্রতিবাদ ও ভালোবাসা। ভূপেন হাজারিকার জন্মশতবর্ষ কেবল উৎসব নয়; এ এক আত্মজাগরণের মুহূর্ত। আমাদের মনে রাখা দরকার, তিনি বলতেন—

"সঙ্গীত মানে না কোনও রাষ্ট্রভাষা,
সুর জানে না কোনো সীমান্ত।"

তাঁকে স্মরণ মানে: সহমর্মিতা মনে রাখা, প্রতিবাদকে সম্মান করা, ভালোবাসাকে বেছে নেওয়া, মানুষের পক্ষে, মানুষের জন্য গান গাওয়া। শেষ কথা; এক সুর, যা কোনও দিন থেমে যায় না।

ভূপেন হাজারিকা ছিলেন না কেবল একজন গায়ক; তিনি ছিলেন এক নদী; যিনি কখনো থেমে থাকেন না। তিনি ছিলেন এক নীরব দ্রোহী; যিনি কণ্ঠ দিয়ে গড়েছেন সেতু, মানুষ থেকে মানুষে, নদী থেকে গাঁথা, স্মৃতি থেকে ভবিষ্যৎ।

আজ, তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ হল—ভাবতে শেখা তাঁর মতো, ভালোবাসতে শেখা তাঁর মতো, গাইতে শেখা তাঁর মতো—

"একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?
ও বন্ধু..."

সহানুভূতি : রন্ধনকর্মীদের চাদর বিতরণ।

হোস্টেলের স্মৃতির পাতা থেকে

জলদবরণ দত্ত
(প্রবেশবর্ষ ১৯৬৬, ইউ ই)

(১)

বিক্ষোভ

১৯৬৭ সালের মার্চ/এপ্রিল মাসে ছাত্রাবাসে আবাসিকদের বিক্ষোভের কথা জানানোর জন্য কলম ধরলাম।

তখন হোস্টেলের মেস চলত মাসে নির্দিষ্ট টাকায়। কেন্দ্রীয় ভাবে ঠিক হত প্রতিদিনের মেনু। কোন আবাসিক প্রতিনিধির প্রশ্ন ছিল না। মাসিক চার্জ ছিল ৩২ টাকা। ঐ টাকায় তেমন খাবার দেওয়া হয়তো সম্ভব ছিল না। তাই খাবার নিয়ে একটা বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল। আমরা এ বিষয়ে তেমন কিছু জানতাম না। সিনিয়র দাদারাই এ বিষয়টি দেখাশুনা করছিল। আমরা যারা ইউ.ই. পড়তাম তাদের সামনে ফাইনাল পরীক্ষা থাকায় এ বিষয়ে নজর দেবার অবসর ছিল না। একদিন কলেজ হতে ফিরে স্নান সেরে খেতে যাবার জন্য যখন তৈরী হচ্ছি তখন দেখি থালাগুলো নেই। খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম এখন খাবার পাওয়া যাবে না। খিদে পাওয়ায় কারো কাছে একমুঠো মুড়ি নিয়ে তাই খেয়ে পড়তে বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর খাবার ঘন্টা দেওয়ায় থালা নিয়ে নিজ নিজ স্থানে বসে গেলাম। শুনলাম না খাওয়ার খবর জেনে ডঃ কে ডি রায় হোস্টেল আসছেন ভাঙা পায়ে প্লাস্টার নিয়েই। এসে একটা চেয়ারে বসে খুব গম্ভীর কণ্ঠে ডাক দিলেন হীরেন মুখার্জী নামে এক সিনিয়ার দাদাকে। তাকে একই কথা তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তর এলো একই কথায়।

— হীরেন, সবাই বলেছে 'খাবো না'?

—হ্যাঁ স্যার।

স্যার জানিয়ে দিলেন হোস্টেল কমিটি করে তাতে আবাসিকদের নেওয়া হবে। আমরা সবাই মুখ নিচু করে খেয়ে উঠে গেলাম।

পরে এ নিয়ে স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর হল, তিন সত্যির মতো তিনবার জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য নিশ্চিত হওয়া। স্যার এই একতা দেখে সন্তুষ্টই হয়েছিলেন।

(২)

নতুন পথ

তখন আমাদের দ্বিতীয় বর্ষ। আমাদের ঘরে একজন থাকত যার বাড়ি ছিল কীর্ণাহারের কাছে কোনো গ্রামে। বাড়ির এক ছেলে। বাড়িতে গরু। মেলা দুধ। ছেলে হোস্টেলে। তাই বাড়ি হতে দুধের তৈরী ক্ষীর, ছানা এ সব নিয়ে মাঝে মধ্যে তার বাবা আসতেন। সঙ্গে মুড়ির টিন। একদিন এ সব নিয়ে তার বাবা এসেছেন। কিছুক্ষণ পর তার বাবাকে বাসে চাপাতে ছেলেটি বেরিয়ে গেছে। আমরা বাকী চারজন এই সুযোগে জিনিসগুলোর সদব্যবহার করতে লেগে গেলাম অবশ্যই তার অংশ রেখে। হরলিক্সের শিশিতে দুধ তাও দু'একজন কিছুটা করে সাঁটিয়েছি। এমন সময় জানলা দিয়ে দেখি কোনো কারণে বাবাকে নিয়ে সে ফিরছে। সঙ্গে সঙ্গে দুধের লেভেল ঠিক করার জন্য জল ঢালার ব্যবস্থা হল। পরে ওর বাবা চলে গেলে তাকে জানানো হল, আমরা ক্ষীরের অংশ সবাই নিয়েছি। ওর জন্য বাকিটা রাখা আছে।

তার পর থেকে আর হোস্টেলে এ সব আসেনি। তবে ছেলে যাতে প্রতিদিন দুধটা অন্তত খেতে পায় তার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাস্তার মোড়ে যে চায়ের দোকান সে বাস থেকে দুধের শিশিটা নিয়ে রাখে। দোকানে গিয়ে ছেলেটা প্রতিদিন দুধ খেয়ে আসে।

আমাদের সান্ত্বনা, আমাদের কাজের জন্যই নতুন এ পথ খুলে গেছে।

(৩)

ছাত্রাবাস শেষ রাত্রি

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাস। বেশ শীত বিশেষ করে ফাঁকা মাঠে হোস্টেলের অবস্থানের কারণে। আমি তখন পরীক্ষা শেষে ছেলেদের প্র্যাক্টিক্যাল শেখানোর কাজে। সঙ্গে অমর চ্যাটার্জী। থাকি নতুন বিল্ডিংয়ের একেবারে দোতলার পূর্ব দিকের ঘরে। সেদিন আমি একা। মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে বাইরে বেরিয়ে দেখি সবাই জামা-কাপড় পরে। কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করায় জানালো কলেজ লাইব্রেরিতে আগুন লাগানো হয়েছে। তখন তো নকশাল আন্দোলন চলছে। মাঝরাতে কিছু করার নেই। তাই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। সকাল হতেই মনে হল, স্বপ্ন নয় তো। বাইরে এসে বুঝলাম আগুনটা বাস্তব। বুঝলাম হোস্টেল ছাড়তে হবে। চায়ের দোকানে দেখি খবর পেয়ে মিলনদা এসেছেন। আমরা কয়েকজন কলেজের অবস্থা দেখতে গেলাম। এতদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ভেঙে চুরমার। লাইব্রেরির আগুন তখনো ধিকিধিকি জ্বলছে। এদিকে আমার কয়েকটা জামা কাপড় ধোবা বাড়িতে। সেগুলো নিয়ে এসে জানলাম খাবার হয়ে গেছে। খেয়ে নিয়ে দুপুরের ট্রেন ধরে বাড়ি চলে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তৈরি হয়ে গেলাম। স্টেশনে এসে দেখি ঐ ঘটনার জন্যই ১২-৩০ এর ট্রেন প্রায় একটায় ছাড়লো।

ওটাই হোস্টেল হতে শেষ চলে আসা।

(৪)

স্মৃতি

ভেবেছিলাম স্মৃতিচারণ করে কোন লেখা হোস্টেল ম্যাগাজিনে আর লিখব না। কিন্তু সম্প্রতি বলরামের জীবনাবসান আবার স্মৃতি উসকে দিল।

সেই ১৯৬৭ সালের ১৬ আগস্ট কলেজে পৌঁছানোর সাথে সাথে ডঃ কে ডি রায় অন্যদের বলে উঠলেন—ঐ দেখ জলদ এসে গেছে। পরে বলরাম আসার পর কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা দুজনে স্যারের কাছে ‘জলা-বলা’ হয়ে গেলাম। বলরামের সব সময় হাসিমুখ সকলকে কাছে টানত। তার সেবাপরায়ণতা আর একটা বড় গুণ ছিল। গান গাইতে পারত। সে বছর বলরামের নম্বর সবচেয়ে বেশি ছিল। তার চেয়ে কম নম্বর পাওয়া স্বপন সাহা রায় তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবত। যাই হোক ইউ.ই পরীক্ষার রেজাল্ট এ নিয়ম মানেনি। হোস্টেলের বাইরের একজন প্রবীর দ্বিতীয় ও আমি তৃতীয় হয়েছিলাম। ফিজিক্স অনার্সে আমরা তিনজন প্রবীর, আমি ও বলরাম। জলা-বলা-টা চলতেই থাকল। অনার্স পাশ করে প্রবীর ও আমি প্রথমেই এম এস সি পড়ার সুযোগ পেয়ে যাই। বলরাম পরে পায় কিন্তু শেষ করতে পারে না। জলা-বলার ব্রেক আপ। পরবর্তী কালে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল। পারিবারিক যোগাযোগও ছিল। আজ সব কিছু ছেড়ে না ফেরার দেশে চলে গেল একজন। কত স্মৃতি জড়িয়ে আছে। যেখানেই থাকো ভালো থেকো।

অতি চালাকির মজা

তুষার ভট্টাচার্য

(প্রবেশবর্ষ ১৯৭৯, ক্লাস ইলেভেন)

আমি ১৯৭৯ সালে ক্লাস ইলেভেনে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে ঢুকেছি। আমাদের ব্যাচে ইলেভেন টুয়েলভ মিলে কুড়ি-বাইশ জন ছিলাম। সেই সময়ের একটা মজার ঘটনা বলি।

এটা ১৯৮০ সালের ঘটনা। আমাদের ক্লাসে সুকুমার চট্টরাজ বলে একটা ছেলে ছিল। মুর্শিদাবাদের কল্যাণপুরে বাড়ি। ওর বাবা নলিনাক্ষ চট্টরাজ ছিলেন রেলের CCM ব্যাচের স্পেশাল চেকার। মানে হাতে একটা লাল ব্যাজ বাঁধা থাকত, আর একটা সোনালি বেল্টে লেখা থাকত নাম 'এন এন চট্টরাজ' এবং তারপরে ডেজিগনেশন।

তখন আমরা ট্রেনের টিকিট কেউ কাটতাম না। ধরলে বলতাম 'স্টুডেন্ট'। যেন স্টুডেন্ট হিসেবে ইউনিভার্সাল পাস আমাদের হাতে ছিল। তখন দুবরাজপুর, দুর্গাপুর, এমনকি ধানবাদের দিক থেকেও ছেলে আমাদের হস্টেলে থাকত। তারা ট্রেনে যাতায়াত করত। আসানসোল পেরিয়ে কুমারডুবি বলে একটা জায়গা থেকে শিবু বলে একজন আসত। ওর সঙ্গে আরও দু'তিন জন আসত ওদিক থেকে।

তো, একদিন ওরা আসছিল ট্রেনে। অণ্ডালের কাছাকাছি টিকিট চেকার ওদের কাছে টিকিট দেখতে চেয়েছে। ওরা যথারীতি বলল, 'স্টুডেন্ট'। চেকার বললেন, 'তোমরা স্টুডেন্ট বলে টিকিট কাটবে না এটা তো হতে পারে না।' এবার শিবু একটু ওভারস্মার্ট হয়ে বলল, 'আমি রেলের স্পেশাল চেকার নলিনাক্ষ চট্টরাজের ছেলে।' এই কথাটা বলে আগে কয়েকবার পার পেয়েছে শিবু। ও এমনিতে চালাক ছেলে। কখনো কথাবার্তা বলে, কখনো 'ওনার ছেলে হয়ে টিকিট কাটোনা' ধরনের কিছু উপদেশ শুনে আগেও ছাড় পেয়েছে।

আজ চেকার মহাশয় একটু থেমে বললেন, 'তাই?'

শিবু তখন বলল, 'হ্যাঁ, আমরা সাঁইথিয়া হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি। বাবা এই লাইনেই কাজ করে তো। তাই ওনার নামটা করলাম।'

চেকার বললেন, 'আমি ওনাকে ভালভাবে চিনি। সবই জানি। তুমি কি তোমার বাবাকে চেনো?'

—'বাবাকে চিনি না মানে, কি ধরনের কথা বলছেন আপনি? ছেলে বাবাকে চিনবে না? নাহলে বাবার নাম করে কেউ ওরকম করে বলে?'

—'সেসব ঠিকই আছে। আমি ওনাকে চিনি, কিন্তু তোমাকে তো চিনি না। তাই বলছিলাম। তুমি কিন্তু তোমার বাবার মতই দেখতে। একদম, পুরো ফিগার তোমার বাবার মতো।'

শিবু তখন একগাল হাসি নিয়ে বলল, 'সে তো হবেই স্যার, সেরকমই তো হয়, লাইক ফাদার লাইক সান।'

চেকার সাহেবও হালকা হাসিমুখে বললেন, 'সেসব বুঝেই আমি তোমাকে বলছি, তুমি কি তোমার বাবাকে চেনো?'

শিবু এইবার ভাবছে ইনি বারবার এই কথাটা বলছেন কেন? চেকার মহাশয় তখন ওনার ব্যাজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দেখেছো এখানে কি লেখা আছে?' সোনালি বেল্টে নামটা ঝকঝক করছে 'এন এন চট্টরাজ'।

তখন শিবুর মুখ হাঁ হয়ে গেছে, 'কাকু!'

'এইত, বাবা থেকে একলাফে কাকুতে নেমেছো।' চট্টরাজকাকু বললেন।

ব্যাপারটা যে টিকিট না কাটার থেকেও বড় ভুল

হয়ে গেছে ততক্ষণে বুঝে গেছে শিবু। 'অন্যায় হয়ে গেছে কাকু। আর হবে না।' বলে স্বীকার করে নিল। উনি তখন নরম হয়ে বললেন, 'আমার ছেলে সুকুমার তো ওখানে পড়ে। তাই তোমার ব্যাপারটা আমি প্রথমেই পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি।' মানে চট্টরাজকাকুও শিবুর সঙ্গে রসিকতাটা জেনে বুঝেই করে নিলেন। 'তবে, একদম ঠিক করোনি কাজটা। যাইহোক, আর কোরো না।' বলে জিজ্ঞেস করলেন, 'তা, নাম কি তোমার?' কিন্তু এই চাপের পরিস্থিতিতেও শিবুর মাথাটা যে চলছে বোঝা যাবে ওর উত্তরে, 'কাকু, আমার নাম অভিজিত চৌধুরী।'

এই ঘটনার কয়েকদিন পরের কথা। আমরা খাওয়ার পর কমনরুমে ঢুকেছি। ক্যারাম, টেবিল টেনিস এসব নিয়ে ঠাই-ঠুই চলছে। সুকুমার এসে বলল, 'আজ একটা হাটে হাঁড়ি ভাঙব।' শুনে আমার রুমমেট রমেশচন্দ্র হেমব্রম একটা অদ্ভুত কাণ্ড করল। সিঁড়ির মুখে নিতাইদার ঘরে কয়েকটা মাটির কলসি রাখা ছিল। তার একটা নিয়ে এল দৌড়ে। হাঁড়ি ভাঙা হবে বলে। আরে ও হাঁড়ি ভাঙা নয়, ওটা রাখ—বলে ওকে থামানো গেল। রমেশ এখন বড় সরকারি চাকরি করে।

'ওভ্যা (অভিজিতকে আমরা ওই নামে ডাকতাম) কই রে?' বলে সুকুমার ওর বাবার কাছে শোনা ওই দিনের ট্রেনের ঘটনাটা পুরো বলল। শিবু তখন ওখানে উপস্থিত ছিল না, ডাইনিং-এ খাচ্ছিল। এইবার অভিজিতকে রাগানো শুরু হবে। আমরা রেডি। কিন্তু অভিজিত সিরিয়াসলি অবাক। বলল, 'দ্যাখ, টিকিট সবসময় আমিও কাটি না। কিন্তু আমি সত্যি সেদিন অণ্ডালের ওদিকে যাইইনি। ছেলেটা কেমন দেখতে কাকুকে জিজ্ঞেস করেছিলি? লম্বা করে? শরীর স্বাস্থ্য ভালো?' তখন দেখি সুকুমারের কপালে ভাঁজ, 'তাইত রে, বাবা বলেছে ছেলেটা মোটা করে কালো করে। তোর সঙ্গে তো একেবারেই মিলছে না।' তাহলে ব্যাপারটা কি? আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়ে গেল। অন্য কেউ ধরা পড়ে ইচ্ছে করে অভিজিতের নাম বলেছে? কে হতে পারে? আমাদের সন্দেহটা চারিদিকে ছড়িয়ে গেল। মনে মনে ময়নাতদন্ত শুরু হয়ে গেছে।

শিবুর কাছে সুকুমারের এই খবর তখন চলে গেছে। খেয়ে কমনরুমে ঢুকেই শিবুর কি লাফ ঝাঁপ, 'চল চল, আজ হাটে হাঁড়ি ভাঙা হোক। এ মানা যায় না। ট্রেনে টিকিট না কাটা। আমাদের সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের বদনাম।' আমরা চোখের সামনে তখন রহস্যের সমাধান দেখতে পেয়ে গেছি। মোটা আর কালো চেহারার শিবু খুব হম্বিতম্বি করছে। যেভাবে, পকেটমার ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখলেই 'পকেটমার' 'পকেটমার' বলে চেঁচায়। সবাই মিলে ধরলাম শিবুকে। গালমন্দ করে বললাম—এ কাণ্ড তুইই করেছিস। সুকুমারের বাবা চেহারার যা বর্ণনা দিয়েছেন, তোর সঙ্গে পুরো মিলে গেছে। শিবু বুঝে গেল আমাদের কাছেও ও ধরা পড়ে গেছে। সুকুমারকে বলল, 'তোর বাবা তো দারুন চালাক!' তখন সবাই মিলে কি হাসি আমাদের।

কত মুক্তোর মতো দিন যে কাটিয়েছি সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে, বলে শেষ করা যাবে না। আরেকটা ঘটনা বলব আর একদিন।

পাঞ্জাবি হোটেলে ডিনার

সন্দীপ দাস

(প্রবেশবর্ষ ১৯৮৭)

সুব্রত একেবারে ক্ষেপে উঠল, ''কি আজকে রাতেও কুমড়োর ঝোল আর ভাত? আজ হোস্টেলে খাবই না। বাইরে খেয়ে আসবো। তোরা কে কে যাবি?''

আমাদের সবারই একমত। কিন্তু একইসঙ্গে পকেটও দেখতে হবে। ভয়ে ভয়ে বললাম 'তা কোথায় খেতে যাবি?'

তপন বলে, 'গেলে যাবো পাঞ্জাবি হোটেলে।'

পাঞ্জাবি হোটেলের তখন সাঁইথিয়াতে খুব সুনাম। স্টেশনের পাশেই, শৈলেনের মিষ্টির দোকানের কাছে। তার তন্দুরি রুটি আর তরকার স্বাদ নাকি অমৃত সমান। আর সেই দোকানের চিকেন নাকি দেবভোগ্য। অতুলনীয়।

তপন বলে, 'ওখানেই চল। চিকেন আর তন্দুরি রুটি খেয়ে আসবো।'

আমি বললাম, 'সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। কোথায় পাবি এত টাকা?'

সুব্রত বিজ্ঞের মতো বলে ওঠে, ''আরে সবসময় নেগেটিভ চিন্তা। তোর কোনো ধারণাই নাই। ওখানে খাবার যেমন ভালো, দামও তেমনই খুব সস্তা।''

তরুণ বলে, 'তাহলে ওখানেই যাওয়া যাক।'

সব মিলিয়ে ছ'জন ঠিক হলো। সুব্রত, তপন, তরুণ, সুজয়, করুণা আর আমি। মেস ম্যানেজারের কাছে সুজয় মেজাজ দেখিয়ে বলে এল, ''আমরা রাতে তোদের ওই পচা কুমড়োর ঝোল খাবো না। মাংস রুটি খেয়ে আসবো।''

যাই হোক, রাতের মিল অফ করে আমরা আটটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম পাঞ্জাবি হোটেলে ডিনার সারতে। তরুণই তাড়া দিয়ে আমাদের বার করল। দেরি করলে নাকি চিকেনের ভালো পিসগুলো আর পড়ে থাকবে না।

আধঘন্টা পরে পাঞ্জাবি হোটেলে আমাদের ছয়মূর্তির প্রবেশ। আমাদের ছয় বন্ধুকে দেখে হোটেলের লোকেরা তাড়াতাড়ি দুটো টেবিল একসঙ্গে লাগিয়ে আমাদের বসার ব্যবস্থা করে দিল। এরপর অর্ডার নিতে ঘাড়ে গামছা নিয়ে একজন হাজির। তখন তো আর মেনু কার্ড থাকতো না। মুখেমুখেই অর্ডার দেওয়া-নেওয়া হত।

আমাদের লিডার সুব্রত। গম্ভীর মুখে অর্ডার দিল, ''সবাইকে দুটো করে তন্দুরি রুটি আর এক প্লেট করে চিকেন দাও। সঙ্গে যেন পেঁয়াজ লংকা থাকে।''

আমার ভীতু মন। সুব্রতর পেটে খোঁচা মেরে আস্তে আস্তে বললাম ''আগে দামগুলো জেনে নে''। সুব্রত খুব বিরক্ত মুখে আমার দিকে তাকিয়ে পরে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলে 'এক প্লেট চিকেনের দাম কত?'

লোকটি বলল, ''চিকেন ফুল প্লেট ২৫ টাকা, হাফ প্লেট ১৫ টাকা আর তন্দুরি রুটি ২ টাকা পার পিস।''

বলে কি!!! তখন আমাদের মেসের মিল চার্জ পুরো মাসে ১৩০-১৩৫ টাকা, পালির মোড়ে এক পিস পরোটার দাম ১ টাকা, সাথে আলুর দম ফ্রি। এতো অস্বাভাবিক চড়া দাম!

আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা মাথার ছেলে তরুণ। সে বলে ওঠে, ''ভাই তুমি জলের গ্লাসগুলো নিয়ে এসো। আমরা একটু আলোচনা করে নিয়ে অর্ডার দিচ্ছি।'' লোকটি বিরক্ত মুখে ফিরে গেল। তরুণ বলল, ''তোরা বোস। আমি আসছি।'' এই বলে তরুণ মালিকের কাছে গলা নামিয়ে কি সব কথা বলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বলল ''আমি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি। যা আসবে খেয়ে নিবি।''

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, 'কি অর্ডার করলি?'

তরুণ বলে, ''আলুপোস্ত আর হাতরুটি। ওটাই

সবচেয়ে সস্তা। রুটি ৭৫ পয়সা আর হাফ প্লেট আলুপোস্ত ৪ টাকা। এরবেশি আমাদের পকেটে কুলোবে না।"

সুব্রত রেগে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল। "আমি খাবই না। কোথায় চিকেন কারি আর কোথায় আলুপোস্ত। আমি চললাম হোস্টেলে।"

তপন বলে, "কিন্তু সেখানে তো মিল অফ। গিয়ে জল মুড়ি খেয়ে থাকতে হবে।"

অগত্যা সুব্রত বেজার মুখে বসে পড়ল। ততক্ষণে খুকখুক করে হাসতে হাসতে সেই লোকটি আলুপোস্ত রুটি নিয়ে হাজির। বলে, "এর সঙ্গে কিন্তু পেঁয়াজ-লংকা হবে না গো।" তারপর সুব্রতর কটমটিয়ে তাকানো দেখে বলে, "ঠিক আছে কটা লংকা দিচ্ছি"। এই বলে হাসতে হাসতে চলে গেল।

কি আর করা! খাওয়াদাওয়ার পরে তরুণ সুব্রতর মন ভালো করার জন্য স্টেশনে নিয়ে গিয়ে মালাই চা খাওয়াল। তারপর হোস্টেলে প্রত্যাগমন।

ক্যানটিলেভারের নিচে থার্ড ইয়ারের দুই দাদার সঙ্গে দেখা। তারাও বাইরে থেকে ফিরছে। আমাদের জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় গিয়েছিলিস?'

তপন বুক ফুলিয়ে উত্তর দেয়, "পাঞ্জাবি হোটেল থেকে তন্দুরি রুটি আর চিকেন খেয়ে এলাম আমরা।"

শুনে দুই দাদার কি হাসি খ্যাক খ্যাক করে। বলে, "আমরা তোদের পিছনের টেবিলেই ছিলাম। তোরা তো লজ্জায় মুখই তুলতে পারছিলিস না। কোনরকমে খেয়ে পালিয়ে এসেছিস।"

এই শুনে আমরা তো যে যার নিজের ঘরের দিকে দৌড়। তখন পিছন থেকে এক দাদা চিৎকার করে বলল, "আরে শোন শোন। আমরাও আলুপোস্ত-রুটি খেয়ে এসেছি। এর থেকে বেশি খরচ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বাজারের কেউ যদি আজ তোদের দেখে থাকে আর কাল জিজ্ঞাসা করে-তবে ওই কথাই বলবি। চিকেন কারি আর তন্দুরি রুটি।"

আমরা সবাই হো হো করে হাসতে হাসতে পেটে হাত দিয়ে বসে পড়লাম।

আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি...

পুরানো সেই দিনের কথা

তাপস সাহা

(প্রবেশবর্ষ ১৯৯২)

যৌবনের প্রারম্ভিক লগ্নে প্রথম দেখা চিরহরিৎ পর্ণমোচী মনে ছাত্রাবাসের রন্ধন কুটিরে বড় বড় দুটি উনুনে প্রজ্জ্বলিত কয়লা ঘুঁটে গুলের গনগনে আগুনের তাপে একটাতে লোহার কড়াইয়ে উদ্ভূত লাভার ন্যায় ট্যালটেলে ফুটন্ত ডাল অন্যটাতে চড়বড়িয়ে অমৃত অন্ন প্রস্তুত হচ্ছে ধোঁয়া বের করে পাতের প্রথমে উদ্গিরনের জন্যে।

একটি পেল্লায় হাঁড়িতে আলু কেটে রাখা আছে, পাশে পরিষ্কার চটের বস্তার উপরে বিরাজমান কচু, কুমড়ো, বেগুন, লাফা, টমেটো। যারা অতি আগ্রহে অপেক্ষায় ঘ্যাঁট তৈরির জন্য। অনতিদূরে শিলপাটার উপর ঘসর ঘসর উৎসাহব্যঞ্জক শব্দে মশলা বাটার কাজ চলছে পুরোদমে। একটি অতি অনাদরে লালিত টাইম কলে আপন খেয়ালে কুলকুল করে যেন শিবের জটা থেকে জল বয়ে চলেছে দায়িত্ব সহকারে। একজন সেই জলের সদব্যবহার করল কিছু কাটা রুই মাছের টুকরো পরিষ্কার করার কাজে। আজ ছাত্রাবাসের আবাসিক সংখ্যা ২২০। রান্না ঘরের পাশে বিশাল ডাইনিং রুমে সিমেন্টের লম্বা প্রসারিত ঢালাই করা রাস্তার ন্যায় উঁচু টেবিল, বসার জন্য নিয়ম মেনে ক্রমবর্ধমান বেঞ্চিগুলি অনাদরে অপেক্ষায় আছে।

লবণ লঙ্কা যেন ভায়রাভাই খুব সুখে তারা একসাথে অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে উপস্থিত হয়ে গর্বের ফানুস উড়িয়েছে। এই সবুজ লঙ্কার বিশেষ মাহাত্ম্য ছিল ছাত্রাবাসের অন্দরে।

'আদি হতে অন্ত সবুজ লঙ্কা জানতো
যৌবনের সর্বপ্রান্তে ধরে বীণা যন্ত্র,
গৌরবময় ইতিহাস মাখা পরাক্রমী বীর
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ জব্দ করার যন্ত্র।'

রসে বসে সময় কাটানোর পর ঘোষালদার তাম্বুল চর্বণ, ফোকলা হাসি, কখনও পেটে সুরার স্রোতে টলমল বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো গর্জন, স্বভাব শান্ত ঊষার নির্ঝরে দিলীপ দার ব্যতিক্রমী খুন্তি নাড়ানো, কলরবে মুখরিত চুইংগাম চেবানোর মতো চঞ্চল ঝলমলে নিতাইদা, অতিপ্রাকৃত 'ঝান্না' হাতে টকলা নয়নের দৃষ্টিতে বিশুদা অন্ন পরিবেশনরত, যাকে প্রথম দেখে মনে হয়েছিল পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানুষ, পরে দেখা গেল সেই মানুষটি সবার অতি আপনজন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, কারো চেহারা দেখে মানুষের বিচার করা মস্ত বড় ভুল। প্রত্যহ প্রতুষে দরজার কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙিয়ে ডালিমের প্রবেশ, ভীষণ ভদ্র নম্র মৃদুভাষী, মনে থেকে যায় আজীবন। এদিকে এক যে ছিল চটপটি চাট, সেই সময়ের আধুনিক মিশাইল টেম্পারেচার ট্যাম্পা, কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি কখন ঝড় কখনো স্রোতের লাভা কখনো ডাবের মধুর জল, এক ব্যতিক্রমী ক্যারেক্টার।

'সুখের লাগিয়া বেঁধেছিনু ঘর
সময়ের স্রোতে গেছে ভেঙে,
হারিয়েছি কত স্মৃতি মেদুরতা
জীবনের সত্য ইতিহাস মেনে।'

নব্বই এর দশক। সাল বিরানব্বই। ছাত্রাবাসের অন্দরে প্রথম প্রবেশের মাঞ্চুরিয়ান অব্যয়, টক ঝাল নুন মিষ্টি দৌড় হয়েছিল শুরু। অচেনার আনন্দ অপু দুর্গার অনুভূতি, বন্ধুত্বের ব্যপ্ততা, দুর্গম গিরি কান্তার মরু অভিযান এর অনুভূতি, বাপিদার দোকানে চপ গ্লাস-রুটির সাথে চা কিংবা শালপাতার ঠোঙায় মুড়ি ঘুগনি কাঁচা পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে হাস্যসমুজ্জ্বল কলরবে একপ্রস্থ সময় কাটানোর এক অনন্য অনুভূতি যা কখনও ভোলার নয়।

'পরতে পরতে ঘাসের শিশির

চোরকাঁটা চুপিসারে ধরে,
পাজামার সাথে লুঙ্গির লটাপটি
পিছল-কাদায় ধপাস পড়ে।'

ঘোর বর্ষায় ফুটবল খেলা, জমা জলে অনাবশ্যক অদৃশ্য লড়াই পা পিছলে আলুর দম, কাদাতে লতপত, আহা কি আনন্দ জন্ম জন্মান্তরে কখনো ভোলা যাবে না। তারপর সর্দি, হাঁচ্চু, জ্বর, মাথাব্যথা যতই আঘাত হানে ততই আমরা এককাট্টা হয়ে রব তুলেছিলাম 'মিলি মিশি করি কাজ হারি জিতি নাহি লাজ'। বড্ডজোর একবাটি সাবু, এক দাগ লালঝোল সিরাপ দাগ মারা বোতলে তিতা ঔষধ আর রাত্রে খান দুয়েক রুটি, বাজার থেকে কিনে আনা গরম রসগোল্লা। ব্যাস দুদিনে শরীর চাঙ্গা।

"হয়েছে মাসের শেষ দিনগুলো কেটেছে বেশ
দিনের বেলা যেমন তেমন রাত্রে জমাট ফিস্ট,
বাসমতি চালের পোলাও সাথে খাসির ঝোল
দই মিষ্টি পান কত আনতে হবে হাতে ধরা লিষ্ট।"

মাসের শেষ। ম্যানেজারি শেষ। হাতে অঢেল টাকা। অডিট হবে রাত্রে, হিসেবনিকেশ মেটানোর পালা। জমানো অর্থের কিছু যাবে বাবা ফাণ্ডে, তার আগে বাকিটাতে কব্জি ডুবিয়ে ভুরিভোজ।

সময়ের সমুদ্রে ভেসে যায় যৌবন। মনে থাকে শুধু স্মৃতি। পড়ন্ত বিকেলে ঢলে পড়া সূর্যটা মনে করে দেয় 'যেতে নাহি দিব' তবুও 'যেতে দিতে হয়', আগামীর অঙ্গীকার ছেড়ে দিতে পথ নব যৌবনের বন্দরে।

ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে...

সত্যানন্দের দিনগুলি, স্মৃতির পাতায় এক হোস্টেল জীবন

মুরারী কৃষ্ণ সাহা
(প্রবেশবর্ষ ২০০০)

২০00 সাল। জীবনের নতুন অধ্যায়ের শুরু। কলেজে ভর্তি হয়েছি, মনে কত রকমের স্বপ্ন! ভাবতাম, কলেজে গিয়ে নতুন বন্ধু হবে, ভালো করে পড়াশোনা করব, জীবনের লক্ষ্যপথে এগিয়ে যাব। ঠিক সেই সময়ই যোগদান করলাম সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে; এক নতুন জগৎ, এক নতুন পরিবার।

পরের দিন সকালবেলায় তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠলাম। প্রথম ক্লাসে যাব, তাই মন ভরা উত্তেজনা। জামাকাপড় পরে ব্যাগ কাঁধে নিয়ে কলেজের পথে বেরিয়ে পড়লাম। মাঠের মাঝখান দিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ এক সিনিয়র ডাক দিলেন—

‘‘এই, কোথায় যাচ্ছিস?’’

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, ‘‘কলেজে যাচ্ছি।’’

তিনি হেসে বললেন, ‘‘এখন মাঠে নাম, খেলতে হবে। কলেজে যাবি সরস্বতী পুজোর পরে!’’

সেদিনের সেই কথাটাই যেন আমার পড়াশোনার মোড় ঘুরিয়ে দিল। প্রথম আর দ্বিতীয় বর্ষে প্রায় কলেজ যাওয়াই হল না। অনেক ক্লাস অনুপস্থিত থাকায় পরে কিছুই বুঝতে পারতাম না। ধীরে ধীরে কলেজের প্রতি আগ্রহটাই হারিয়ে গেল। আজও ভাবলে কষ্ট হয়। ওই সিনিয়রকে এখনো মাফ করতে পারিনি... আর হয়তো কোনোদিনও পারব না।

তবু হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা অন্যরকম ছিল। আমি তখন খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে, গালাগাল দিতে জানতাম না। জীবনে কখনো কোনো দেব-দেবীকে খারাপ কথা বলব;এমন ভাবনাও মাথায় আসেনি। কিন্তু সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে এসে এক অদ্ভুত অভ্যাসের মুখোমুখি হতে হল; এখানে দেবদেবীর নাম নিয়ে লেখা ‘মহাযান’ নামের খিস্তিভরা কবিতা মুখস্থ করতে হত! সবার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ও রিগিং এর ভয়ে আমাকেও শিখতে হল সেটা। আমার কাছে সেটাই ছিল সবচেয়ে কঠিন ও কষ্টের অভিজ্ঞতা।

তবে সব কষ্টের মাঝেও হোস্টেল জীবনটা ছিল অসাধারণ। হাসি, খুনসুটি, বন্ধুত্ব, রাতভর আড্ডা, একসাথে খাওয়া, খেলার মাঠের মজা; এই সব কিছুই মনে পড়লে আজও মন ভরে যায়। সেই হোস্টেল থেকেই শিখেছি, কীভাবে একে অপরকে সাহায্য করতে হয়, কীভাবে ভাইয়ের মতো বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে।

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস শুধু একটা থাকার জায়গা ছিল না, ছিল জীবনের এক বড় স্কুল। এখানে পেয়েছিলাম এমন সব বন্ধু, দাদা আর জুনিয়র ভাই, যাদের কারণে আমি আজকের আমি।

আজ যখন পেছন ফিরে দেখি, মনে হয়; যা কিছু হয়েছি, যা কিছু শিখেছি, সবই ওই হোস্টেলের কৃপায়।

সত্যানন্দ ছেড়ে এসেছি বহুদিন, কিন্তু সত্যানন্দ এখনো আমার ভেতর বেঁচে আছে; স্মৃতির আলোয়, মনের আয়নায়, প্রতিটি ভালোবাসার মুহূর্তে।

একটি ক্লাসিক হোস্টেল জীবনের গল্প

পূর্ণচন্দ্র সরকার
(প্রবেশবর্ষ ২০০০)

চেতনার ধারা :

দুই যুগ পর প্রযুক্তি একাল ও সেকালকে মিলিয়ে দিয়ে রচনা করেছে সত্যানন্দ ছত্রাবাসের 'মহাকাল'। এমন হবে তা কে জানত? ইতিহাসটা যদি 'শ্রী শ্রী ঠাকুর সত্যানন্দ মহারাজ' থেকে শুরু হয় তবে নবাগত শেষ আবাসিকও জানে অব্যক্ত প্রাগৈতিহাসিক কাহিনি। কাহিনি নয় এটা 'চেতনা বীজ'। নামই মানুষকে জাগ্রত করে পরিচয় দান করে। সত্যানন্দ, অভেদানন্দ এগুলি শুধু নাম নয়—আদর্শ, শক্তি, আশ্রয় এবং ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি, সমানুভূতির উৎস দাতা। 'Be Like A Flower' মতো বাণী মন্ত্র সকলকে জীবনের পথ দেখায়। ইতিহাস ফিরে ফিরে আসে। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের রিইউনিয়ন মিলন মেলার মাধ্যমে আজ জুনিয়র থেকে সিনিয়র সকলেই যেন এক মালার ফুল।

মিলনের আহ্বান :

একদিন হোয়াটসঅ্যাপে হঠাৎ ফোন 'লেখা দিতে হবে'। ওদিকে গিরি সব বলে দিয়েছে। আমার সম্মতি আদায় শুধু নয় এরপর হোয়াটসঅ্যাপে প্রতিদিনই 'কতদূর হল, দিতে হবে'। ফেবুতে লেখা আর মহাকালের ইতিহাস লেখা এক নয়। প্রযুক্তি যুগে যাই লিখি না কেন মনে হয় তা অতি সাধারণ। বন্ধু গিরি আর বুবুলদার অকৃত্রিম অদম্য আবেগকে সম্মান জানিয়ে লিখছি—'একটি ক্লাসিক হোস্টেল জীবনের গল্প'।

তাছাড়া ভেবে দেখলাম এখানে সবাই দোকানি, সবাই ক্রেতা। সবাই ঘুমালে স্ফটিকস্বচ্ছ স্মৃতিকে জাগিয়ে ফিরে গেলাম আমার প্রিয় ছাত্রাবাসে।

ব্যাচমেট ও রুমমেট :

বন্যার বছর ২০০০ সালে কলেজের আবাসিক লিস্ট বের হওয়ার পূর্বেই সঞ্জয় মণ্ডল-দার হাত ধরে হোস্টেলে প্রবেশ করলাম। শোনা যায় ২০০০ সালের হোস্টেল ব্যাচ ৩০ জনের অধিক ছিল। স্বপন, অরবিন্দ, গিরিধারী, আম্বিয়া, শাহ আলম, বিশ্বজিৎ, মুরারি, আলি রেজা, রামকৃষ্ণ, তপেস, শুভেন্দু, কাঞ্চন, চন্দন, রাজেশ, সৌমেন, মোশারফ, প্রকাশ... এরা সকলেই মেধাবী এবং প্রতিভাবান। সম্ভবত এই ব্যাচের আমিই ছিলাম ব্যতিক্রম—'বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন মানুষ'।

হোস্টেলে প্রবেশ করার পর আমি একটি গুরুদায়িত্ব পেয়েছিলাম সেটি হল আমার ব্যাচের বন্ধুদের সঙ্গে 'উপরের ডাক' দাদাদের যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া।

LEARNER PERIOD

ইনডোর : অভাবের যুগে পরিচয় পর্ব ছিল গুড়-বাতাসা-হীন কিন্তু উষ্ণ। শীতের রাতে পরিচয় পর্ব চলার সময় রুমটি উষ্ণ হয়ে উঠত—পরিচিতির বৃত্ত সম্পূর্ণ হওয়ার হিসাব আর মিলত না। ভাগ্যিস হোস্টেলের লেটার হেডে কোনো পরীক্ষা হয়নি।

আউটডোর : আউটডোরের প্রশিক্ষণ ছিল 'কানু' হয়ে ওঠার প্রশিক্ষণ। 'কেরামত'দার স্কুলে আমি ছিলাম কেয়ারটেকার উইথ রিং মাস্টার। কুয়ো পরিবৃত্ত কাঁঠাল, নারকেল, আমের কুঞ্জবনে আমিষ নিরামিষ প্রশিক্ষণ ছিল ভারী মজার, কিন্তু আমি হয়ে উঠলাম বন্ধুদের কাছে চক্ষুশূল।

প্রথম প্রথম শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ছিল টিভি রুম, ডাইনিং হল আর ছিল আমার প্রিয় পেপার

বোর্ড। পেপারগুলো চিবিয়ে চুষে ছিবড়া করে দিলেও 'অপূর্ব' দাদা তাতে শিখিয়েছিল শব্দগুলোর মাঝে কি বললে জাবর কাটা সহজ হয়।

হোস্টেল পরিবেশ : আট বছরের হোস্টেল জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসে সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে পেলাম একটি নিজস্ব জগতের সন্ধান। এক অদ্ভুত মৌলিক সংস্কৃতি আর স্বাধীনতার জগৎ। যদিও তখন স্বাধীন দেশটির নাগরিক মেরে কেটে নব্বই হয়তো।

সুপার তরুণ বাবু :

১) **সান্ধ্যভ্রমণ :** প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় তিনি আসতেন এবং রুমে রুমে ঘুরতেন। তাঁর নজরদারি শ্রদ্ধার এবং শিক্ষণীয়।

২) **আলাপী ভাষা :** 'কাঁসার বাটিতে দুধ' খাওয়া-বাড়ির ছবি মনে করাতেন।

৩) **শৃঙ্খলা রক্ষা :** জানিনা, হয়তো কোনো আবেগ বা উৎসাহ বশে একবার রবিউল দাদারা পাঁচ টাকা করে তুলে রাতে মাঠে রান্নার উদ্যোগ নিলে তরুণবাবু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সে উদ্যোগ ভেস্তে দেন।

নিয়ম ও ছাত্রদের কুটকৌশল :

১) **আগমন ও প্রস্থান খাতা :** সম্ভবত কলেজের এক নবাগত সংস্কৃত শিক্ষক মহাশয় শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য Arrival and Departure স্বাক্ষর খাতাটি চালু করেন।

২) **সই :** নিতাইদা, বিশুদা, ট্যাম্পাদা, কালিদা, গৌতম দাদা-দের সামনে সই করে আহার সংগ্রহ করা বিষয়টি বিশেষ ঐতিহ্য বলেই মনে হওয়ায় একবার প্রতিবাদে 'K.D Layek' নামের মতো লিখলাম P.C SARKAR. সে কি কেলেঙ্কারি!

৩) **মেস কমিটি এবং অডিট :** পাঁচজনের মেস কমিটিতে নিয়ম ছিল অত্যন্ত কড়া। ভোর রাতে অডিট শেষ হলে তার খবর আবার পেতাম কলেজে গিয়ে সুপারের মুখ হতে।

'ভুল না ধরলে মাস্টার কেন?' তাই সারা মাস খেটে কিছু ভুলের জন্য যাতে ফাইন দিতে পকেট কাটা না যায় তার জন্য 'নিতাই'-বিহীন রবিবারের 'ঘুঁটে' কে সবাই টার্গেট করত।

প্রিফেক্টদের মূল্যায়ন : 'সুবীর দা ও বরুণদা' জুটি, 'স্বপন ও অরবিন্দ' জুটি দায়িত্বের সঙ্গে কর্তব্য পালন করেছে। দায়িত্ব পড়াশুনাতে সাময়িক গতি কমাতে পারলেও মৌলিক প্রতিভাকে দমন করতে পারেনা। সাফল্য প্রমাণ করে তারাই নায়ক।

রূপান্তরে সাক্ষী : গাঁ-গঞ্জ থেকে আসা সব কচি কচি ১৮ বছরের তরতাজা যুবক। তারা সব যেন খাল-বিল-নদী থেকে এসে ক্লাসিক হোস্টেলে ১৮-র সমুদ্র ঢেউ তুললো। বিকাশ ও বিনাশ সবই আপাত।

বন্ধনে রি-ইউনিয়ন : কেউ হারায় না, নিজে হারিয়ে না গেলে। সত্যানন্দের বাগানে সব ফুলই সুন্দর। জীবন কারো দশে কারওবা লাখে থামতে পারে কিন্তু সবার যোগফল সমান ভাগ হয়ে যায় মিলন মেলায়। সব ফুল একটি মালায় গাঁথা হবে, তবেই না—'ফুল সুন্দর হও' হবে।

রত্ন ভাণ্ডারে মক্ষিকা : আনন্দ-বিনোদন, অবসর জীবন, খেলাধূলা, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও উৎসব, প্রতিযোগিতা, ভবিষ্যতের রাজনৈতিক নেতা তৈরি, শিল্প ভাবনা, শিল্পীর সম্মান দান, জল ব্যবস্থা থেকে দূরাভাস সবই ছিল আধুনিক।

নবীনবরণ আর সরস্বতী পুজো ছিল শ্রেষ্ঠ উৎসব। সাঁইথিয়ার মানুষ, ছাত্র ছাত্রী দলে দলে প্রচুর সংখ্যায় আসত উঁচু বড়ো প্যান্ডেল আর আলপনার রঙ্গোলি দেখতে আর এখানে এসে অনেকে মন হারাত। শিল্পীর প্রেমিক হয়ে উঠত আমাদের গেস্টি। সুপার তরুণ বাবু ভালো ভালো ফুলের টব, বিরল ক্যকটাস, বনসাই পাঠিয়ে দিতেন।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য আয়োজন হল ভ্রমণ। রাকেশ দা, মানব দা, শ্রীমন্তদা, সুবীরদা, তুষার দা—এদের তৎপরতায় হোস্টেল আবার জেগে উঠত আয়োজন আনন্দে। মিটিং, অর্থ সংগ্রহ, বাস দেখা এবং শেষ দিন দুপুর বেলায় গিয়ে বাস নিয়ে আসা—ওঃ! সেই দিনগুলো ভোলার নয়।

আমি দুটি ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলাম। সম্ভবত ২০০১ সালে আমরা গিয়েছিলাম ফুন্টশিলিং, ভুটান তিস্তা নদীর ধারে। প্রচুর ভালো কমলা লেবু পাওয়া যায় ওখানে। অনেকে তো এক বস্তা লেবু কিনে ফেলেছিল। ৮০টি বড় বড় কমলা লেবু কিনেছিলাম ৪০ টাকায়। বন্ধু সৌমেন দে যদি সেদিন সাহায্যের হাত না বাড়াত তবে দূরকে দেখা সম্ভব হত না। পরের বছর ট্যুর ছিল আরো সুন্দর এবং ইতিহাস চেতনার স্থান নালন্দা, রাজগিরি, পাওয়াপুরী, বুদ্ধগয়া, গয়া, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি। হয়েছিল সীতা মাতার অভিশপ্ত ফল্গু নদীতে স্নান।

আমি, সোমপ্রকাশ মুখার্জী, সঞ্জয় মণ্ডল ছাড়াও আরো একজনের সহায়তা, সহানুভূতি কোনদিনও ভুলব না। ২০০৩ সালে আমি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য ভর্তি হই। ভর্তি হওয়ার পরে আমি প্রায় এক মাস বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হইনি। কি আর করা যাবে! গেলাম যখন তখন অনেকের হোস্টেল লিস্ট বেরিয়ে গিয়েছে। আমি শুধু শুনেছিলাম যে রাকেশদা হোস্টেলে থাকে। কোন হোস্টেলে থাকে তাও জানতাম না। ছেলেদের যে পাঁচটা হোস্টেল আছে তাও জানি না। সন্ধ্যার সময় আমি অরবিন্দ হোস্টেলের গেটে এলাম। ওখানে ত্রিপুরার এক আবাসিক বলল, রাকেশদা মাঠে আছে, চলো আমার সঙ্গে। কিছুটা দূরে মোহনবাগানের মাঠে রাকেশদাকে সব বললাম। রাকেশদা বলল কোনো চিন্তা নাই, চল সব ব্যবস্থা করে দেব। তারপর হোস্টেলে ফিরে এসে রাকেশদা তার নিজের বেড আমাকে ছেড়ে দিয়ে বলল, যতদিন থাকবি তুই থাক। আমি খুব ইতস্তত করছিলাম, কারণ এত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা বালিশ। এছাড়াও দাদা ঈশ্বর ভক্ত।

এই দাদাটি সম্ভবত এমনিই। তাই সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে আমার লেপ নিয়ে কাউকে দেয় আমার অনুপস্থিতিতে। একবার আবার রাকেশদা ভুল ইনফরমেশনে হোস্টেলের তথ্য পাচারে দোষী ভেবে আমার কাছে জানতে চেয়েছিল। রাকেশ দা তোমার প্রতি যেন আমি চিরকাল শ্রদ্ধা রাখতে পারি।

একদিকে Physically challenged person, অন্যদিকে খুবই সাধারণ ঘরের গ্রামের ছেলে হয়েও আজ শিক্ষকতা নামক গুরু পেশায় যুক্ত হতে পেরেছি তার একটি বড় অবদান আমার বন্ধুবর্গ ও স্বজনবৃত্ত। আমার প্রতিটি হোস্টেল (চারটি) ছেড়ে আসার শেষ দিনে শেষ মুহূর্তে শুধু প্রার্থনা করতাম—আমি চিরকাল যেন হোস্টেলে থাকতে পাই এবং আমার চিরকাল যেন লেখাপড়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। দ্বিতীয়টি একশ শতাংশ পূর্ণ হলেও প্রথম শর্তটি এখনো পূর্ণ হয়নি। তাই, অপূর্ণের শর্ত পূরণ করার জন্য সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে যেতেই হবে 'পূর্ণ'-কে।

অতীত-বর্তমান ও আমি

এই তো কয়েকদিন আগে নবমীর দিনে বন্ধু গিরির ডাকে আমাদের পাঁচ ছয় জন বন্ধু মিলে তারাপীঠ রোডের উপর একটি হোটেলে ছোট্ট 'গেট টুগেদার' হয়ে গেল।

হাসি মজার ছলেই বন্ধু পূর্ণকে বললাম "পড়াশোনায় আমরা সম মেধাসম্পন্ন হয়েও তুই দিব্বি হাই স্কুলের মাস্টার মশাই হয়ে গেলি আর আমি 'প্রায় মরা' মাস্টার হয়ে রয়ে গেলাম।" পূর্ণর আমাকে দেওয়া সেদিনের জবাবটা (বন্ধু, হোস্টেলের দিনগুলোতে তুই যখন বন্ধুদের সাথে টিফিনে, সিগারেটে ও আনন্দে ব্যস্ত,আমি তখন বাড়ি থেকে আনা মুড়ি, চিনি ও জলের প্রোটিনে-বইগুলোকে বন্ধু করে এগিয়েছি। তা বন্ধু আমার ঐ ত্যাগ ও কষ্টের দিনগুলোর বিনিময়ে আমি আজকের আমি)। আমাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করল—তাহলে কি আমি কিছুই পাইনি। বেশ কয়েকদিন এর উত্তর খুঁজছি।

আজ বন্ধু গিরি ও বুবুলদার বার বার দেওয়া ধাক্কায় পত্রিকায় লেখার চেষ্টায় আমার জীবনের এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছি। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের একজন আদর্শ আবাসিক হিসাবে আমার এই লেখা নিজের জীবনের আবেগ ও ভালোবাসার গল্প। আসুন কয়েকটা ঘটনা বলি আমার জীবনের। ও হ্যাঁ, গল্পের শিরোনামে আমার নাম দেখতে পান নি তো?

অপেক্ষা করুন। আগে কয়েকটা গল্প বলি।

ছোটবেলায় সেই মাটির দেওয়াল টিনের ছাদের প্রাইমারি স্কুলে বন্ধুদের সাথে পড়তে পড়তে কাজী নজরুল ইসলামের—

"মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান।
মুসলিম তার নয়নমনি, হিন্দু তাহার প্রাণ।"

লাইনগুলোকে মনের খাতায় সযত্নে রাখতে রাখতে যখন বড় হতে থাকলাম তখনও বাবা ও মায়ের নীতি আদর্শে সেই একই সুর পেয়েছি। এরপর সময়ের চাকায় গড়িয়ে গড়িয়ে ২০০০-এ এসে পড়লাম সত্যানন্দ দেবের পাদপদ্মে।

এক ঝাঁক তরতাজা বন্ধুদের সাথে ভেসে গেলাম যৌবনের জোয়ারে। তাইতো বাংলা অনার্স শেষ না করেই বাড়ি ফিরলাম। তবে একবারে খালি হাতে ফিরিনি। দাদাদের স্নেহ, বন্ধু ও ভাইদের ভালবাসায় সবার অতি প্রিয় ও কাছের 'দা' হয়ে উঠলাম।

ঘটনা-১

হোস্টেল থেকে বেরিয়ে যাওয়া তখন চার পাঁচ বছর হয়ে গেছে। যদিও জুনিয়রদের সাথে যোগাযোগ ছিল। মাঝে মাঝে হোস্টেল আসতাম। একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে, হোস্টেল থেকে খবর গেল—গিরি হোস্টেলে আসছিল, দুর্ঘটনায় ওর পা ভেঙে গেছে, হসপিটাল-এ তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে হবে। তখন নিজের কোনো গাড়ি ছিল না বা যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব ভালো ছিল না।

শীতের দিনে সন্ধ্যা ৫.৩০ টায় শেষ বাস ধরে গ্রাম থেকে বেরিয়ে আবার রামপুরহাটে বাস চেঞ্জ করে যখন হোস্টেলে এলাম উৎকণ্ঠা নিয়ে, তখন দেখি বেশ কয়েকজন পুরনো বন্ধুদের আড্ডা ২০ নম্বর ঘরে। মধ্যমণি গিরিবাবু বহাল তবিয়তে। সবাই আমাকে দেখে হো হো করে হেসে উঠল। রাগ ও অভিমান করে বেশ কিছুক্ষণ থাকলাম বটে। কিন্তু আবার সব উধাও। তিন চারদিন হস্টেলে মজা করে যে যার বাড়ি ফিরলাম।

ঘটনা ২

দুর্গাপুজোর ছুটিতে হোস্টেল প্রায় ফাঁকা, রান্না বন্ধ। আমি, স্বপন ও আরো দুই-একজন আছি হস্টেলে। পকেটে টান পড়েছে। চার-পাঁচ দিন কি করে যে চালাই? হঠাৎ মনে পড়ল বন্ধু মুরারি সাহার কথা। খুব সঞ্চয়ী ছেলে। হাত খরচের টাকা জমিয়ে জমিয়ে কৌটোতে রাখে ট্রাঙ্কের ভেতেরে। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে দিলাম। মুরারি ফিরে এলো। দেখলো টাকা উধাও। কোনো রাগ নেই, চিৎকার নেই। ভদ্র ছেলের মতো গিয়ে বললাম, 'তোর ট্রাঙ্কে টাকা থাকতে তোর বন্ধুরা না খেয়ে মরবে, তাই কি হয়?'

যাইহোক চার পাঁচ দিন রাজার মত টিফিন সেরেছিলাম বন্ধু মুরারির টাকায়। থ্যাংক ইউ মুরারি।

ঘটনা ৩

হাড়কিপ্টে বন্ধু প্রকাশ ঘটক। বাড়ি থেকে বড় কৌটো করে দেশি ঘি নিয়ে এসে ট্রাঙ্কে রাখত। কাউকে দিত না। ব্যাটা একবার বাড়ি গেল। তালা ভেঙে ঐ এক কৌটো ঘি শুধু খাওয়া নয়, সবাই মিলে জ্বলনে সারা গা ও মাথায় মেখেছিলাম। বন্ধুত্বের বন্ধন এতটাই গাঢ় ছিল যে, প্রকাশ খুব মজা পেয়েছিল ঘটনাটায়।

উপরের তিনটি ঘটনা যুবক বয়সে মজার ছলে যে দৃঢ় বন্ধনের বীজ বপণ করেছিল তার রেশ পরবর্তী কালেও স্থির আছে, জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে।

আমি 'গোলাম আম্বিয়া', ধর্মে মুসলমান। গল্পের শুরুতেই জীবনের যে প্রাপ্তির খোঁজে বের হয়েছিলাম তা হল—

'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান।'

ভিন ধর্মের ছেলে হয়েও প্রতি ক্ষণে ক্ষণে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে যে ভালোবাসা পেয়েছি তার কয়েকটি ঘটনা বলব।

ঘটনা ৪

হোস্টেল ছাড়ার পর সব বন্ধুরা প্রায় বেকার। তবে মাঝে মাঝে বন্ধুরা মিলে দুর্গাপুরের পলাশডিহায় বন্ধু অরবিন্দ শী-র বাড়ি যেতাম ও বেশ কয়েকদিন কাটাতাম। কাকু, মানে অরবিন্দের বাবা ছিলেন DSP PLANT-এ কর্মরত ও কাকিমা ছিলেন গৃহবধূ। অতগুলি বন্ধুর অত্যাচার তারা মুখ বুজে সইতেন। অতগুলো বন্ধুর মধ্যে এক ভিনধর্মী বন্ধুর জন্য কাকিমা একটু অস্বস্তি বোধ করতেন। তবে কাকু ছিলেন মাই ডিয়ার মানুষ। কাকিমার ফিলিংসগুলো-কে তিনি বার বার নিজের ফিলিংস দিয়ে ঢেকে দিতেন।

আমিও ঠিক করলাম কাকিমার 'নিজের' হয়ে উঠব একদিন।

আস্তে আস্তে যাতায়াত বাড়তে লাগল। কাকিমার পছন্দের হয়ে উঠতে লাগলাম। আমার পছন্দসই মেনু বানানো, পাশে বসে খাওয়ানো ইত্যাদি। প্রথম প্রথম যে মানুষটার আমাদের ঘরে কদাচিৎ প্রবেশ ঘটত, পরবর্তীতে সেই মানুষটার রান্নাঘর পর্যন্ত আমার অবাধ প্রবেশ ঘটেছিল। আমি সেটা নিজ গুণে ও আচরণে অর্জন করতে পেরেছিলাম।

একদিন কাকিমা কে বললাম, 'আজ বন্ধুরা মিলে সিটি সেন্টার ঘুরতে যাব, রাতে রান্না কোরো না'। কাকিমা বলল, 'জানি তোরা কি ছাই-পাঁশ খাবি। তবে বাবা সুস্থ অবস্থায় সঠিক সময়ে বাড়ি ফিরিস।' সেদিন কাকিমার কথাগুলো শুনে কেঁদেছিলাম। কাকিমার মধ্যে সেদিন নিজের মাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। মা-এর কোনো জাতি-ধর্ম হয় না, সন্তানদের জন্য সে শুধু মা...

আজ কাকিমা পরপারে পাড়ি দিয়েছে, কিন্তু আমার জীবনে 'তুমি' থেকে 'তুই' হয়ে ওঠার গল্পটা জীবনখাতার অঙ্কগুলোকে মিলিয়ে যাবার শিক্ষা দিয়ে গেছে।

ঘটনা ৫

হঠাৎ দুর্গাপুজোর দিন আমার এক বন্ধু আমার বাড়ি এসে হাজির। আমি তো অবাক। এত বড় উৎসব ছেড়ে ও আমার বাড়িতে কেন? খোঁজ নিয়ে জানলাম, বাড়িতে ভুল বোঝাবুঝির কারণে ও কাউকে না বলে আমার বাড়ি এসেছে।

ওদিকে দু'একদিন খোঁজ না পাওয়ায় ওর বাড়ি থেকে মিসিং ডায়েরি করার তোড়জোড় শুরুর সময়

বাড়ির লোকেরা জানতে পারে ও আমার বাড়িতে উঠেছে।

যাইহোক, পুজোর ঐ কয়েকটা দিন ও আমার বাড়িতেই থাকল। কিন্তু সমস্যা হল বন্ধু আমার নিরামিষভোজী। আর আমার পরিবার প্রতিদিনের আমিষভোজী। আমার মাও ওই কয়েকটা দিন বাড়িতে সবার জন্য নিরামিষ খাবারের আয়োজন করেছিল। সবাই একসাথে মহা আনন্দে খেয়েছিলাম।

ঘটনা ৬

সালটা সম্ভবতঃ ২০১২। কলকাতায় একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে জব করছি। হঠাৎ কলকাতার আকাশ বাতাস উতপ্ত। দম বন্ধ করা পরিবেশ। মুসলিম সম্প্রদায় বেশ চাপে। কারণ সুপ্রিম কোর্টে ভারতের বিখ্যাত এক মসজিদ এর ঐতিহাসিক রায় বেরোবে কি বেরিয়েছে। আমার কলকাতার বেশ কিছু বন্ধু আমাকে দ্রুত কলকাতা ছাড়ার পরামর্শ দিল। সেই মুহূর্তে বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব হবে না বুঝে এক হিন্দু ধর্মের বন্ধুকে (যদিও 'বন্ধুর কোনো ধর্ম হয় না', ঘটনার গভীরতা বোঝাতে শব্দটি উল্লেখ করলাম) ফোন করে ওর বাড়িতে থাকব বললাম। ওই পরিস্থিতিতে শুধু বন্ধু নয়, ওর বাবা মাও আমাকে নিজের বাড়িতে সস্নেহে বেশ কয়েকদিন আগলে রেখেছিলেন।

নিজের জীবনের আদর্শ নিয়ে চলতে চলতে আজ বর্তমানে আবার কিছুটা মন খারাপের গল্প। সুজলাং সুফলাং শস্য শ্যামলাং ভারত মায়ের আকাশের ওজন স্তরের ছিদ্র দিয়ে সুপরিকল্পিত ভাবে অশুভ শক্তিরা ভাতৃত্ববন্ধনের শক্তি পরীক্ষার জন্য কিছু অতি বেগুনি রশ্মি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

এত সোজা নয় এই বন্ধন ভাঙা।

ভারত মাতার রক্ষাকবচ 'ভারতীয় সংবিধান' ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দেশের নাগরিক হিসাবে আমাদের আশু কর্তব্য—

১) নবপ্রজন্মকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করা।

২) ছোট থেকেই শিশুদের মধ্যে ভাতৃত্ব বোধের বীজ বপন করা।

৩) সামাজিক কাজ কর্মে নব প্রজন্মকে নিযুক্ত করা।

৪) Social Media কে সঠিক ভাবে বুঝতে শেখা।

আমি নিজে আজ সবার পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করি, কতটা করতে পারলাম সেটার মুল্যায়ন সময়ের হাতে ছেড়ে দিলাম।

পরিশেষে যে কথা বললেই নয়, আমাদের ছাত্রাবাসের এই গ্রুপে আমি ভারত মাতার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। সবার সাথে ও সবার পাশে দাঁড়ানোই এখানে মূল মন্ত্র। অবশ্যই ছাত্রাবাসের পরিচালন কমিটির সুদক্ষ নেতৃত্ব ও কর্মকাণ্ড সাধুবাদ যোগ্য।

আসুন শপথ নিই কবি সুকান্তের ভাষায়—

"...যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপনে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,"

এই পৃথিবীকে প্রতিটি শিশুর বাসযোগ্য করে যাব।

গোলাম আম্বিয়া

(প্রবেশবর্ষ ২০০০)

স্মৃতিটুকু থাক

দেবব্রত ঘোষ

(প্রবেশবর্ষ ২০০০)

পাড়ার কালীপুজোটা সবে শেষ হয়েছে। আজ আছে খিচুড়ি খাওয়ানোর অনুষ্ঠান। আমি বসে বসে কতগুলো ছেলের খিচুড়ি খাওয়া দেখছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ল আমার হোস্টেল-জীবনের একটা ছোট ঘটনা।

তখন হোস্টেলে আমাদের সাত-আট জনের একটি দল ছিল, সাঁইথিয়ায় যে কোন জায়গায় নরনারায়ণ সেবা হলেই আমরা ঠিক পৌঁছে যেতাম। এটা আমাদের কাছে খুবই কৃতিত্বও গৌরবের মনে হতো। নরনারায়ণ সেবায় যোগ দিতে পেরে আমরা নিজেদের ধন্য মনে করতাম। আমাদের এই মহান কাজ এবং তার খবরাখবর জোগাড় করার প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে আমাদের দলপতি গিরি-র। তো, সেবার এই রকমই এক কালীপুজো উপলক্ষ্যে সাঁইথিয়ার এক ক্লাবে তিন-চার হাজার মানুষকে খাওয়ানোর আয়োজন চলছে। আমরা খবরটি পেয়ে যথাসময়ে গন্তব্যস্থলে হাজির। অবশ্য ক্লাবের সদস্যরা আমাদের আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি করেনি। আমরাও সগৌরবে তাদের আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম এবং কালবিলম্ব না করে একই লাইনে সকলে বসে পড়লাম। স্টেজ পারফরমেন্স এর আগে যেমন বড় বড় কলাকুশলীরা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে তাদের উপস্থিতি জানান দেয়, আমরাও তেমন এক একজন দু-তিনটে করে পাতা নিয়ে একসাথে পাশাপাশি সাজিয়ে একমনে জমিয়ে খিচুড়ি খাওয়ার আয়োজন শুরু করলাম। এরপর শুরু হল আমাদের মহাভোজ। আমাদের এই কার্যকলাপ যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে আমরা আমাদের ব্যাটিং চালিয়ে যাচ্ছিলাম পুরোদমে। হঠাৎ খবর এল একজনের বিশেষ গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন। গিরি রক্ত দেওয়ার জন্য রাজি। রক্ত দিতে সিউড়ী যেতে হবে, তাই গিরি শার্টটা আমার সাথে এক্সচেঞ্জ করার জন্য যেমনই নিজের শার্টটা খুলেছে, একজন (হয়তো আমাদের কার্যকলাপ অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করছিল) বলে উঠল, ‘‘দাদা, খিচুড়ি খেয়ে কি খুব গরম লেগে গেল! যা ব্যাটিং করছো তোমরা...’’। বিন্দুমাত্র লজ্জা না পেয়ে আমরা হো হো করে হেসে উঠলাম।

আজ AI-এর যুগে এইসব ঘটনা হয়তো নিছকই নির্বোধের কার্যকলাপ বলে মনে হয়। তবুও গভীরভাবে মিস করি সেদিনের এরকম ছোট ছোট ঘটনাগুলোকে, আর এগুলো দিয়েই আমাদের হোস্টেল-জীবন পূর্ণতা লাভ করেছিল।

প্রণবেন্দু কাপ ২০০৬ : সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের মাঠে একটি স্মৃতির শুরু

পার্থ সারথি পাল

(প্রবেশ বর্ষ ২০০৪)

প্রণবেন্দুদা; আমাদের প্রিয় প্রণবেন্দুদা। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের প্রতিটি মানুষ তাঁকে চিনত, ভালোবাসত। হঠাৎ করেই একদিন, প্রণবেন্দুদা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর সেই অকাল প্রয়াণ আমাদের হৃদয়ে এক গভীর শূন্যতা তৈরি করেছিল।

প্রণবেন্দুদা'র স্মৃতিতেই সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের মাঠে জন্ম নিল এক আবেগঘন উদ্যোগ— 'প্রণবেন্দু কাপ'।

২০০৬ সালের সেই ফুটবল প্রতিযোগিতা আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে। সেই অমলিন স্মৃতিরই কিছু অংশ আজ তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

পরিকল্পনা থেকে মাঠে

তৎকালীন ক্রীড়া সম্পাদক অনেক ভাবনা-চিন্তা, আলোচনা করে গঠন করেছিলেন ১২টি দল; প্রত্যেকটিতে ৫ জন করে খেলোয়াড় (লটারির মাধ্যমে)। খেলার ধরণ ছিল নক-আউট পদ্ধতিতে।

সেই সকালে ছাত্রাবাসের মাঠ যেন অন্য এক রূপে সেজে উঠেছিল। কেউ থালা বাজাচ্ছে, কেউ চেঁচিয়ে দলকে উৎসাহ দিচ্ছে; চারপাশে শুধু চিৎকার, হাসি আর উত্তেজনার স্রোত। সত্যি বলতে, ছাত্রাবাসের মাঠটা যেন আমাদের হৃদয়েরই এক টুকরো ছিল, কত স্মৃতি বিজড়িত।

মনে পড়ে, বৃষ্টির দিনগুলোতে সবাই যখন আড়াল খুঁজত, তখন চন্দন সরকারদা (২০০২) একাই ফুটবল নিয়ে মাঠে নামত আর বলত 'চল রে ভাই, খেলি একটু!' সেই ডাকেই সবাই সাড়া দিতাম আমরা, যেন প্রাণ ফিরে পেত মাঠটা। একটা বিশেষত্ব ছিল ফুটবলের। 'ফ' টা না জানলেও, কি একটা টান, মাঠটা আমাদের সবাইকে একত্রিত করত।

টুর্নামেন্ট-এর ম্যাচগুলো একের পর এক এগোতে লাগল। উত্তেজনা, রাগ, হাসি, ঠাট্টা, ঝগড়া; সবকিছুই মিশে যাচ্ছিল এক অনন্য বন্ধনে। অবশেষে, সবাইকে হারিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ফাইনালে।

সেই রোমাঞ্চকর ফাইনাল

ফাইনালে প্রতিপক্ষ ছিল সুশীলের দল। সবার নাম মনে নেই কিন্তু কাঞ্চন পাল (২০০৩) ও শান্তনু সরকার (২০০৬) সুশীলের টিম-এ ছিল। সুশীল—যাকে আমি ছোটবেলা থেকেই চিনি, একসঙ্গেই কাটিয়েছি ছোটবেলা। বলতে গেলে আমি ছিলাম ওর সব খেলার পার্টনার। খেলাধূলা যেন ওর রক্তে মিশে আছে। ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ক্যারাম, তাস, দাবা, ছোটবেলার মার্বেল খেলা; যে খেলাতেই হোক, সুশীল সবসময়ই সেরা।

সেই ফাইনাল ম্যাচের সময় ওদের এক খেলোয়াড় টিউশনে চলে গিয়েছিল, তাই তারা মাঠে নামল মাত্র চারজন নিয়ে (অবশ্য আমাদের দিক থেকে অসম্মতি ছিল বলেই)। কিন্তু সেই ঘাটতি যেন সুশীল একাই পূরণ করছিল। ওর শটগুলো এত নিখুঁত ছিল যে মনে হচ্ছিল, গোল করার জন্য যেন ও গণিতের সূত্র ব্যবহার করে স্কেল ফেলে শট নিচ্ছে।

ওর দলের কাঞ্চন, যার ফুটবলে তেমন অভিজ্ঞতা ছিল না বললেই চলে, বোধহয় ফার্স্ট টাইম ফুটবলে পা

দিয়েছেল। তবুও সুশীল ওকে পোস্টের পাশে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল; বল ওর গায়ে লেগে ফিরে এসে সরাসরি জালে ঢুকে যাচ্ছিল!

স্কোর যেন কে আগে যেতে পারে সেইরকম রেস লাগিয়েছিল, কখনও সুশীলের টিম কখনও আমার টিম। শেষ মুহূর্তে খেলায় আর মাত্র এক মিনিট বাকি, রেজাল্ট ৬-৫। সুশীলের টিম গোল করলে সমান সমান। সেই মুহূর্তে আমি পেলাম একটা ফ্রি কিক। ভাবলাম, সুশীলের সেই কৌশলটাই এবার আমিও ব্যবহার করব।

আমাদের দলে ছিল ২০০৩ ব্যাচের সনাতন, (সিনিয়র হলেও দাদা বলিনা কারণ কাঞ্চন ও সনাতন আমার গ্রামের বন্ধু), যার ফুটবল দক্ষতাও কাঞ্চনের মতোই সীমিত, বোধহয় সেকেন্ড টাইম ফুটবল খেলা। আমি ও ওকে দাঁড় করালাম ঠিক ডানদিকের পোস্টের পাশে। বলটা শট নিলাম মিডল রাইট আউট এর জায়গা থেকে, শট নেওয়ার পর সোজা ওর গায়ে লেগে বল ৪৫ ডিগ্রি ঘুরে ঢুকে গেল জালে! গোওওওওওল।

সনাতন নিজেও বুঝতে পারেনি কীভাবে গোলটা হল—আর আমরা তখন উল্লাসে ভেসে যাচ্ছি!

বিজয়, শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা

শেষ পর্যন্ত আমরা জিতলাম ৭-৫ গোলে। আমি আর সুশীল—দু'জনেই হ্যাটট্রিক করেছিলাম। ম্যাচসেরা হিসেবে আমার নাম ঘোষণা হলেও, মনে মনে জানতাম; সুশীল আমার চেয়ে অনেক ভালো মাপের খেলোয়াড়।

খেলা শেষে মাঠেই আয়োজিত হয়েছিল ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান। হোস্টেল সুপার, প্রাক্তন আবাসিক, সহপাঠী; সবাই মিলে প্রণবেন্দুদাকে স্মরণ করলেন গভীর শ্রদ্ধায়।

হাতে যখন 'প্রণবেন্দু কাপ' ট্রফিটা উঠল, মনে হচ্ছিল—প্রণবেন্দুদা কোথাও থেকে আমাদের দেখছে, হয়তো একটু হেসে বলছে, "দারুণ খেলেছো ভাই!"

প্রণবেন্দু কাপ; শুধু এক খেলা নয়

আজও যখন চোখ বন্ধ করি, সেই দিনটা মনে পড়ে—থালা বাজানো, চিৎকার, হাসি, দৌড়ঝাঁপে ভরা সেই দিন। এটা শুধুমাত্র একটা ফুটবল ম্যাচ ছিল না, এটা ছিল প্রণবেন্দুদাকে স্মরণ করার এক সুন্দর উপায়।

প্রণবেন্দুদা সম্পর্কে তেমন, অনেক কিছু জানার সুযোগ হয়নি, তবু তাঁর নামটা আজও আমাদের আবাসিকদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, একটা অসমাপ্ত কিন্তু অমলিন স্মৃতির মতো।

ছাত্রাবাসের বর্তমান প্রজন্ম

ফিরে দেখা

আদিত্য দে

(প্রবেশ বর্ষ ২০০৪)

প্রেক্ষাপট

২০০৪ সালের ২ অক্টোবর, শনিবার সকাল ৯:৩০ থেকে ১০:৩০ টার মধ্যে সত্যানন্দের দেবভূমিতে আমার প্রথম আগমন। উপর থেকে প্রথম বার্তা কানে এলো; 'First year, Room No. 1'। দ্বিতীয় বার্তা (ব্যক্তির পরিবর্তন); 'একাই এসেছিস? অপেক্ষা কর।' নিচে আমার সামনে এসে—'সঙ্গে যা এনেছিস, একবারে গেট থেকে রুমে নিয়ে যা।' ভারী বিছানা-পত্রের বান্ডিল, দুটি ঝোলা (থলে) ও একটি মুড়ির ঢপ মাথায় এবং দুই হাতের সাহচর্যে নিয়ে অতিকষ্টে প্রান্তীয় ১নং রুমে পৌঁছালাম। মনে মনে ভাবলাম, বিশ্ব অহিংস দিবসের প্রাক্কালে প্রতিহিংসার শিকার হলাম, অথচ বারবেলা না পড়া সত্ত্বেও শনিদেবের কৃপাদৃষ্টি আমার উপর বর্ষণ হতে শুরু করল। রুম নং-১ পূর্বদিনে আগত বন্ধু কৌশিকের সঙ্গে আলাপ, পরে আমার বিদ্যালয়ের সহপাঠী দীপঙ্কর ও অপূর্বের সঙ্গে প্রান্তীয় কক্ষে আমাদের অবস্থান, রাতের ভোজনে অগ্রজ দাদাদের অতিরিক্ত ভালোবাসার ফলস্বরূপ বন্ধু দীপঙ্কর ও অপূর্বের ছাত্রাবাস ত্যাগের সিদ্ধান্ত, ভয়-ভীতি-আশঙ্কা ইত্যাদি বিপরীত পরিস্থিতির মাধ্যমে আমার স্বপ্নিল, রঙিন ও বর্ণময় ছাত্রাবাস জীবনের প্রারম্ভ। পরবর্তী প্রভাত অবশ্য চমক নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। আগের রাত্রে যে দাদারা আমাদের গরমে রেখেছিল সেই দাদারাই আমাদের হৃদয় গলিয়ে দিয়ে তার ভিতরে চিরকালের মতো ঢুকে গেল যখন তারা অপূর্ব, দীপঙ্কর ও আমাকে নিয়ে চলে গেল বাপিদা'র আনন্দ আড্ডায়, জোর করে আমাদের মুখে ঢুকিয়ে দিল খাবার। আমি বুঝতে পারলাম আসলে এই নরমে-গরমে, শাসনে-সোহাগে রাখা সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের ট্র্যাডিশন যা আমাদের এক সুতোয় গেঁথে রাখে।

সাহচর্য ও জীবনধারার পরিবর্তন

অতি সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলের মতো ভালোভাবে পড়াশোনা করে কিছু একটা করা; এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা, ফলস্বরূপ বন্ধু-বান্ধব, গল্প-আড্ডা থেকে দূরে থাকা ও ঘরের মধ্যে বই নিয়ে বসে থাকা (যা অনেকের হিংসার কারণ); এটি ছিল আমার প্রথম দিকের দিনলিপি। কিন্তু পরে কৌশিক, পার্থ, বিদ্যুত, সুবীর, বিষ্ণু, সুরেশ, সৌমেন, প্রভাত, প্রভাস, কবীর, মইদুল, শালহে, অশোক, বাপ্পাদা, বাহালুলদা, অনন্তদা, আজিমদা, কাদেরদা, আতিকুরদা, সনাতনদা, কাঞ্চনদা এবং আরও অন্যান্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহচর্য আমার জীবনধারায় আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। বুঝতে শিখলাম, জীবনযুদ্ধে অর্জুন নয়, কর্ণই শ্রেষ্ঠ নির্বাচন। এই জীবনদর্শন আমাকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে শিখিয়েছে।

মেস ম্যানেজার ও জীবনে উপলব্ধি

আমি যখন মেস ম্যানেজার ছিলাম, একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যার আসল খলনায়ক আমি সবার কাছে, বিশেষ করে ঘটনার শিকার দুই দাদার কাছে, আবারও ক্ষমা চাইছি। ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; আমি আমার সহকারী ম্যানেজার দীপঙ্করের আপত্তি উপেক্ষা করে এক অগ্রজ দাদার মিল বন্ধ করেছিলাম। সেই দাদার সঙ্গে আমার কথোপকথনে, অন্য এক দাদার আমার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে সমর্থন জানালে দুই দাদার মধ্যে বচসা, হাতাহাতি ও আলোচনা সভা পর্যন্ত গড়ায়। অনেক

জলঘোলার পর ঘটনার নিষ্পত্তি হয়। মেস ম্যানেজার হওয়ার সময় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধির সংযোজন হয়; যথা, উচ্চপদধারী ব্যক্তিদের সমীহ করতে হয় এবং তাদের তেলমর্দন করতে হয়, বলশালী ব্যক্তিদের এড়িয়ে চলতে হয়, যারা তথাকথিত শ্রদ্ধেয় নিঃসন্দেহে তাদের শ্রদ্ধা করতে হয়, আর যারা সাধারণ তাদের উপর সব কিছুই প্রয়োগ করা যায়।

ক্ষমতা ও ক্ষমতার দখল

এই ছাত্রাবাসের মনোরম, শান্ত, মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশকে কখনো কখনো বিনষ্ট করেছি আমরা ক্ষমতা দখলের জঘন্য রাজনীতি ও ক্ষমতার অপপ্রয়োগের মাধ্যমে। ক্ষমতা এমন একটি বিষয় যার সঙ্গে কূটনীতি এবং তার অপপ্রয়োগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ক্ষমতার প্রয়োগে নিরপরাধ আবাসিককে, খেলা থেকে বেশ কিছুদিন নির্বাসিত হতে দেখেছি। এর প্রয়োগে আমি আমার পছন্দের ব্যক্তিকে দায়িত্ব প্রদান করেছি, আবার ক্ষমতা ও কূটনীতির প্রয়োগে আমরা ইনট্রা-হোস্টেল ভলিবল টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়েছি।

কুশীলব

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস জীবন গঠনে, মরনে-বাঁচনে সবসময়ের সঙ্গী হয়েছে, আর এই দেবভূমির গুরুত্ব ও মহত্ত্ব অধরা যায় যদি এখানকার কুশীলবদের বর্ণনা বাদ দেওয়া হয়, যেমন—

কৌশিক : এতবড়ো বাচালের সঙ্গে ছাত্রাবাসেই পরিচয়। বাচাল বললাম এই কারণে, প্রথম আলাপে সেটাই মনে হয়েছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার নানাবিধ গুণের মুখোমুখি হলাম; তার যুক্তি, তর্ক ও সমালোচনার ক্ষমতা অসাধারণ, সেটাই সকলের প্রিয় হওয়ার প্রধান কারণ। তাছাড়া, সকলের জন্য ভাবনা, সমাজের ও ছাত্রাবাসের পরিবেশের মলিনতা দূর করার প্রচেষ্টা, মানুষ চেনার ক্ষমতা, সর্বোপরি সবার দুঃখের দিনে সর্বাগ্রে তাকে পাওয়া, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরও বেশি প্রস্ফুটিত হয়।

পার্থ : এরকম সরল, নির্ভিক, দৃঢ়চেতা, বলিষ্ঠ ও সহৃদয় বন্ধু পাওয়ার সৌভাগ্য, সত্যানন্দের আশিসে আমাদের সেই প্রাপ্তি হয়েছিল। খেলাধুলা-আদ্যন্ত-প্রাণ, তাই সর্বত্রই তার আচরণ, তার বলিষ্ঠ শরীর আমাদের দুঃসাহসের যোগান দেয়। যা চেয়েছি, পেয়েছি; শূন্য হাতে ফিরে আসতে হয়নি।

সুবীর : সুবীর এমন এক ব্যক্তিত্ব, যে বাস্তবের লড়াই বড্ড কঠিন জেনেছে ও জানিয়েছে, সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর পথও সে দেখিয়েছে, অথচ Selfish Giant এর Little Child এর মত হাত ধরে আমাদের উপরে উঠিয়ে, নিজেই কোথাও চিরতরে বিলীন হয়ে গেল।

বিষ্ণু : নামে পরিচয় জয়, সর্বত্রই তার কর্ম, ভাবাবেগ ও উপস্থাপনার জন্য। বহুমুখী প্রতিভা, অনেকের হিংসার কারণ, শান্ত-শিষ্ট-মার্জিত ভাষা ও শারীরিক আচরণের মাধ্যমে কীভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়, সেটাই ছিল তার থেকে অনুকরণীয় উপাদান।

বাহালুলদা : সোনার মতো উজ্জ্বল ও মূল্যবান, কিন্তু তার ব্যক্তিত্বের এত উজ্জ্বলতা ও মহত্ত্বের সঠিক কারণ আমি আজও খুঁজে পাইনি। তবে এইটুকু বুঝেছি; কৌশিকের মতো মানুষ চেনার ক্ষমতা ও পথভ্রষ্টদের ঠিক পথে নিয়ে আসার সুচিন্তিত পরামর্শ দেওয়ার ক্ষেত্রে তার থেকে জুড়ি মেলা ভার। বেশিরভাগ আবাসিকের পরিচয় ও কর্মপত্রের খোঁজ তার মনে কম-বেশি থাকত।

পরিশেষে

আবারও বলি; সত্যানন্দ ছাত্রাবাস আমার কাছে স্বর্গভূমি, আবাসিকরা দেবতুল্য। জীবনের কঠিন পরিস্থিতিতে তার স্মৃতিচারণেই সমস্ত রুদ্ধদ্বার খুলে যায়, রসদ পায় যুদ্ধ করার ও আশা জয়ের।

চোখের দেখা, প্রাণের কথা...

কৌশিক ভট্টাচার্য

(প্রবেশ বর্ষ ২০০৪)

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই;
প্রীতি নেই; করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

— জীবনানন্দ দাশ

প্রফেট জীবনানন্দের এই অতি আলোচিত অথচ অমোঘ উপলব্ধি আজকের পৃথিবীতে আমরা যারা নিত্য অনুভব করি তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি কতটা প্রয়োজনীয় এই ছাত্রাবাস, কতটা অপরিহার্য এই যূথবদ্ধতা, কতটাই না জরুরি আরও বেঁধে বেঁধে থাকা। শঙ্খ ঘোষের কথা মনে পড়ে—

আমাদের ডান পাশে ধ্বস
আমাদের বাঁয়ে গিরিখাদ
....
আমাদের পথ নেই কোনো
আমাদের ঘর গেছে উড়ে

আমাদের এই মানসিক আবাসহীনতা, এই নিকষ নিরাশ্রয়তা দূর করতে আমাদের শঙ্খ ঘোষকে দরকার, দরকার আরও বেঁধে বেঁধে থাকার। এই বেঁধে বেঁধে থাকার অপর নাম বন্ধু। আর এই বন্ধু শব্দটা উচ্চারিত হলেই আমার ছাত্রাবাসের কথা মনে পড়ে, হোস্টেল গ্রাউন্ডের কথা মনে পড়ে, ক্যান্টিলিভার, ছত্রিশ নম্বর রুমের পাশে পুকুরের জলছবি, কলেজ ফেস্ট বা ছাত্রাবাসের ম্যাচে ছাদ কাঁপানো, থালা বাজানো মনে পড়ে, মনেপড়ে আদিত্য, পার্থ, সুবীর, বিষ্ণু, অনন্তদা, কাঞ্চনদা, রঞ্জিতদা, বাহালুলদা, অমর, অশোক, সৌমেন, কবীর, বুবুল, বৃন্দা, জীবা আরও অজস্র মেটদের কথা। রবি ঠাকুর ধার করে ছাত্রাবাসের উদ্দেশ্যে বলতে পারি—'গ্রহণ করেছ যত/ঋণী তত করেছ আমায়'। আমি ঋণী সত্যানন্দের নামাঙ্কিত এই ছাত্রাবাসের কাছে। আর চিরকাল ঋণী থেকে যেতেই চাই। এর ঋণ শোধ করার স্পর্ধা আমার নেই। আমরা কি মাতৃঋণ শোধ করতে পারি, পিতৃঋণ? তাহলে কীভাবে এই বন্ধুতার ঋণ শোধ করব? আর কোন বন্ধুর ঋণ শোধ করব আমি? যে বন্ধু, বন্ধুর অসুস্থতার কথা শুনে সদ্যপ্রাপ্ত চাকরি উপভোগ না করে দিল্লি থেকে ব্যাঙ্গালোর চলে আসার আশ্বাস দেয়, সেই বন্ধুর ঋণ? না কি সেই দাদার ঋণ শোধ করব যে দাদা ভাইদের গায়ে শীতের কম্বল নেই দেখে চুপিসারে ঘুমন্ত ভাইদের গায়ে কম্বল চাপিয়ে নিজে গামছা গায়ে কুঁকড়ে রাত্রি যাপন করে? কিম্বা সেই দাদার কথা যে দাদা বিদেশ-বিভুঁইয়ে হঠাৎ আটকে যাওয়া দাঙ্গায় চুপসে যাওয়া ভাইয়ের প্রেমিকার ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, আশ্রয় দেয় নিজস্ব আলয়ে? পার্থর কথা বলছি আমি, কথা বলছি অনন্তদা-র, কাঞ্চনদা'র। কাঞ্চনদা-র বাড়ি গিয়েছি সেবার আমরা বেশ কিছুজন—সম্ভবত আমি, সন্দীপদা, রঞ্জিতদা, পার্থ আর কেউ একজন। আমরা সবাই মলয় বাতাসে ভেসে যাচ্ছি সন্ধ্যাবেলায়, ভেসে যাচ্ছি সাগরদিঘির সাগরে। হঠাৎ কাঞ্চনদা-র বন্ধু অরূপদা বলল—'পুলিশ, পালাতে হবে' আর বলেই সে নিজে ছুট দিল। ফলত আমরা যারা সাগরদিঘিতে নব্য পদার্পণ করেছি, আমরা যারা সাগরের জল ও দিঘীর হাওয়া কোনোটারই স্বাদ-গন্ধ জানি না তাদেরকেও ছুটতে

হলো। অনেক দিন হয়ে গেল সে ঘটনার, অনেক কিছুই ভুলে গেছি কিন্তু যেটা ভুলতে পারিনি জলকাদামাখা অন্ধকার জমি বরাবর ছুটতে ছুটতেও আলোর চিহ্নস্বরূপ সিগারেট হাত থেকে ফেলিনি, আর দেখি বন্ধু পার্থ, সারথির মত আমার রথ আগলে আছে, আমাকে ফেলে চলে যায়নি। সেই দিনের পর থেকে বন্ধু শব্দটার আশ্চর্য আলোবাতাস আমার ভিতরে চলাচল করতে শুরু করল। ইংরেজি স্টোরিতে পড়া 'A friend in need is a friend indeed', আমার অভিজ্ঞতায় সচল হয়ে উঠল। তারপর থেকে অজস্রবার পার্থর 'আমি আছি তো' শব্দবন্ধ আমার জীবনে বর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সিউড়ির চাঁদমারি মাঠে ব্যর্থ প্রেমিকের হয়ে গুণ্ডাগিরি করাই হোক কিম্বা একাডেমিক সার্টিফিকেটের জন্য দিল্লিতে পিওনগিরি, পার্থ, তার রুমমেটের জন্য সবকিছুই করেছে। শিকড়ের মতো এই যে জড়িয়ে জড়িয়ে থাকা, পদ্মফুলের মতো এই যে নিমজ্জন অনেক সৌভাগ্যের ফল। তার ঋণ শোধ করার মতো মূর্খামি আমি অন্তত ইহজীবনে করছি না।

অল্পবয়সে আমার জীবনে একটা আফসোস ছিল যে আমার নিজের কোনো দাদা নেই, আমার পরিচিত অনেকের তাদের দাদাদের কাছ থেকে পাওয়া আদর এবং আড়াল খুবই ঈর্ষণীয় ছিল আমার কাছে। কিন্তু সেই আফসোস বাপি বাড়ি যা-র ঢঙে গ্যালারি পার করে দিয়েছেন যে দুজন বীরপুরুষ তারা হলেন অনন্ত মণ্ডল এবং কাঞ্চন ভট্টাচার্য। আজকের দিনেও অফিসে, কাছারিতে, রাস্তায়, ঘাটে ওরা যখন আমার পরিচয় দেয় বলে এটা আমার ভাই, কখনো বলেনি হোস্টেলের ভাই। আমি নিজেও কতবার আমাদের জুনিয়রদের হোস্টেলের ভাই বলে পরিচয় দিয়েছি। সেটা অবশ্য আমারই ক্ষুদ্রতা আমি জানি, কিন্তু যেটা আরও বেশি জানি জলে, স্থলে বা অন্তরীক্ষেও ওই দুই ভদ্রলোক আমাকে ভাই বলেই পরিচয় দেবে হোস্টেলের ভাই বলবে না। অনন্তদা-র ক্ষেত্রে যদিও আমার আচরণ দাদার মতো বেশি ছিল একটা সময়, আমিই ওকে শাসন করতাম অকারণে, কারণ এই মানুষটাকে কখনো নিজের জন্য কিছু ভাবতে দেখিনি হোস্টেলে থাকাকালীন তো বটেই, তারপরও একটা দীর্ঘ সময় জুড়ে। আমরা যে মজা করে সবাই বলি বিভিন্ন জনকে 'দাদা, তুমি দেবতা', সেটা অনন্তদা-র ক্ষেত্রে বাস্তবেই সত্যি ছিল। আমি হোস্টেল লাইফের দীর্ঘ একটা স্প্যান জুড়ে প্রায় দশ বছর (হোস্টেলে থাকা ও তার পরবর্তী কিছু বছর) অনন্তদাকে একবারের জন্যও 'না' এই শব্দটি উচ্চারণ করতে দেখিনি। যার ফলস্বরূপ একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলের কেরিয়ার যেখানে যেতে পারত তার ধারেকাছেও যেতে পারেনি সেই সময়ে। আজ অনন্তদা নিজগুণে ও পরিশ্রমে প্রতিষ্ঠিত করেছে নিজেকে। কিন্তু যে ত্যাগ সেইসময় সে করেছে আমাদের ও ছাত্রাবাসের জন্য আমরা তার প্রকৃত মর্যাদা দিতে পেরেছি কি? আমি নিশ্চিত পারিনি।

এবার আসি আমার অন্যতম প্রধান অপছন্দের মানুষটার কথায়। অপছন্দের মানুষ কারণ চিরকাল সে একরোখা, নিজের মতো চলবে, কারোর কথা শুনবে না, নিজের ভালো জীবনে নিজে বুঝবে না, হাজার বচ্ছর ধরে বুঝিয়ে তোমার হাড়ে জল দাঁড়িয়ে গেলেও তোমার কথা সে নেবেনা অথচ মাঝরাতে তোমাকে জ্বালাতন করবে, নিজে তো শান্তিতে থাকবেইনা আবার অন্যকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না। লোকটাকে আমি দু-চক্ষে দেখতে পারিনা অথচ তার ফেয়ারওয়েলের দিনই আমি গোটা হোস্টেল কেঁদে ভাসিয়েছি, লোকটাকে দেখলে আমার গা জ্বলে যায় অথচ তার পাঁচ নম্বর ঘরটাতেই আমি, পার্থ, অনন্তদা, দেবাশীষদা একসাথে সকালে উঠেছি ও রাতে শুতে গেছি। লোকটা নিশ্চয়ই কালা জাদু জানে নাহলে তার নানারকম হাড়বজ্জাতি থাকা সত্ত্বেও, তার অকথ্য অত্যাচার সত্ত্বেও লোকটাকে নিজের দাদা ছাড়া অন্য কিছু কেন মনে হয় না? নিজের রক্তের না হয়েও কেন যে লোকটার প্রতি নিজের রক্তের লোকেদের থেকেও বেশি টান অনুভব করি? আরও আশ্চর্যের লোকটার সাথে আমার ব্যবহৃত টাইটেল 'ভট্টাচার্য'টাও কেমন অকারণেই মিলে যায়!

"বন্দে, মায়া লাগাইছে
পিড়িতি শিখাইছে
দেওয়ানা বানাইছে
কী যাদু করিয়া বন্দে মায়া লাগাইছে!"

এই ছাত্রাবাস আমার কাছে ম্যাজিক সারকেল। আমি চিরকাল এখানে সেফ ফিল করি, ফিল করি আনন্দ ধারা। এখানকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস মোটেই অনুকূল নয়, বরং প্রচণ্ড ছোঁয়াচে। ইহজীবনে এখান থেকে আমার নিস্তার নেই, আর পরজনম বলে যদি কিছু থাকে তখনও আমি এখান থেকে নিস্তার পেতে চাই না। আমি নিশ্চিত আমার মতো অনেকেই এই ছাত্রাবাসের ভাইরাস সারাজীবন মস্তিষ্কের মধ্যে বহন করে চলে এবং এই ছাত্রাবাসে কাটানো 'পুরানো সেই দিনের কথা' ভেবে অকারণ আহ্লাদিত বা অশ্রুসিক্ত হয়। শুরুতে বলেছিলাম আমাদের মানসিক নিরাশ্রয়তার কথা, বলেছিলাম শঙ্খ ঘোষকে আঁকড়ে থাকার কথা কারণ উপরিউক্ত কবিতার শেষাংশ যেন আমাদের হাসিকান্না, আমাদেরই হীরা পান্নার নিজস্ব দস্তাবেজ, আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় ছাত্রাবাস শঙ্খ ঘোষের এই মণিমুক্তো যেন যুগ যুগ ধরে ধারণ করে চলেছে আমাদেরই বন্ধনের সাক্ষীস্বরূপ...

পৃথিবী হয়তো বেঁচে আছে
পৃথিবী হয়তো গেছে মরে
আমাদের কথা কে-বা জানে
আমরা ফিরেছি দোরে দোরে।
কিছুই কোথাও যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হাতে হাত রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

আমাদের এই বেঁধে বেঁধে থাকায় চলো আমরা কাজল পরাই, আমাদের এই বেঁধে বেঁধে থাকায় যেন কারো নজর না লাগে কারণ আমরা জানি আয়নাহীন যে সমাজ ক্রমাগত আমাদের চারপাশে তৈরি হয়ে চলেছে সেখানে "হাতে হাত রাখা খুব সহজ নয়/বইতে পারা সহজ নয়"। চলো আমরা শপথ নিই—এই ছাত্রাবাসের সকলে যেন আমৃত্যু হাতে হাত রেখে চলতে পারি, আমরা যেন বইতে পারি একে অপরের আনন্দ-ভার। এই শারদের প্রাতে আমার রাত পোহানোর আগে প্রাণের ঠাকুরের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের দামিনীর মতোই ছাত্রাবাসের উদ্দেশ্যে একটু নিজস্ব ঢঙে বলি 'এই জনমে সাধ মিটলো না...'

তাই, শুধু আসছে জনম নয়, জনমে জনমে যেন তোমাকে পাই।

সাক্ষাৎকার

ছাত্রাবাসের দীর্ঘসময়ের রন্ধনকর্মী নিতাইদা-র অনন্য সাক্ষাৎকার

নিতাইদা একটা বটবৃক্ষের নাম। নিজের কর্মজীবনের সমস্ত সময়টা সমর্পণ করেছেন সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের হাতে। সুইপার হিসেবে অস্থায়ী পদে কাজে যোগদান করেছিলেন। পরে স্থায়ী হন এবং রন্ধনকর্মী হিসেবে কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। সদাহাস্যময়, সাধারণ চেহারার মানুষ। সবার সঙ্গে বন্ধুর মত মিশেছেন। একটা বিস্তৃত সময় ধরে আমাদের আসা যাওয়া দেখেছেন। যেন অখ্যাত রেল-স্টেশনের সেই গ্রাম্য স্টেশন মাস্টার, যে প্ল্যাটফর্মে সবুজ পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকে, সামনে দিয়ে দুড়দাড় করে এক্সপ্রেস ট্রেন চলে যায় বড় শহরের দিকে। এভাবেই দেখতে দেখতে অবসর নিয়েছেন। আজ মানুষটা বৃদ্ধ। কিছুটা অসুস্থও। নিজের গ্রাম কুন্ডলায় পরিবারের সঙ্গে থাকেন। এখন কথা কম বলেন। আমাদের এই পত্রিকার পাতায় আমরা ধরে রাখতে চেয়েছি আমাদের জীবনের ঊষালগ্নের সেই ফ্ল্যাগ-বিয়ারার নিতাইদার কিছু অন্তরঙ্গ কথা।

আলাপচারিতায় আমাদের ছাত্রাবাসের প্রাক্তনী সুজিত দাস (প্রবেশবর্ষ ১৯৯২)।

প্রশ্ন : নিতাইদা, সেই উঠতি বয়েসে আপনার সঙ্গে দেখা। কখনো গার্জেন কখনো বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু আপনার পুরো নাম আমাদের অনেকেই এখনো জানে না। আপনার পুরো নাম আর ঠিকানা বলুন তো।

নিতাইদা : সে অনেকেই জানেনা। নিতাইদা নিতাইদা করে পাগল করে দিত। আমার নাম অধর হাজরা, ডাক নাম, নিতাই। ঠিকানা হল মোহনপুর, কুণ্ডলা, বীরভূম।

প্রশ্ন : আপনি তো সুইপার হিসেবে কাজে জয়েন করেন। সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে কবে কাজে যোগদান করেছেন সুইপার হিসেবে?

নিতাইদা : হোস্টেলে কাজে যোগদান১৯৭৩ সাল।

প্রশ্ন : আর পার্মানেন্ট হলেন কবে?

নিতাইদা : ওটা হল ১৯৮১ সালের এপ্রিল মাসে। তখন থেকে হলাম হেল্পার।

প্রশ্ন : রিটায়ার করেন কত সালে?

নিতাইদা : অবসর নিলাম ২০২০ সালের জুলাই মাসে।

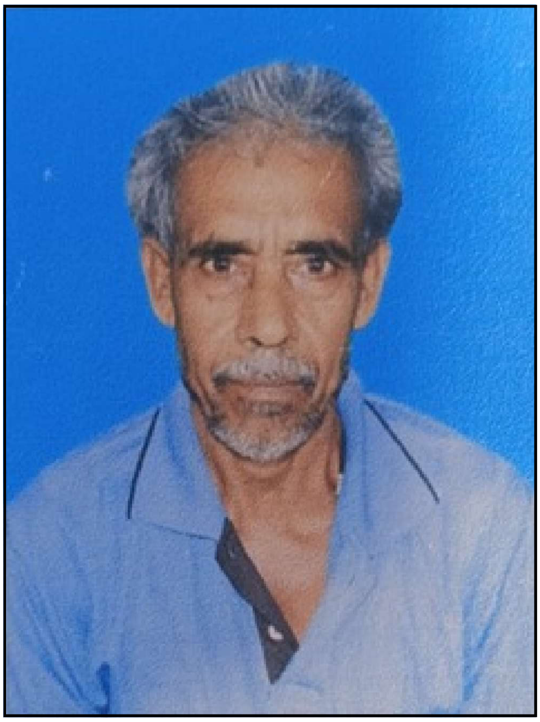

নিতাইদা

প্রশ্ন : এখন পরিবারের সঙ্গে থাকেন বুঝতে পারছি। কে কে আছে পরিবারে?

নিতাইদা : আমার ভরা সংসার। এখন পরিবারে আছে স্ত্রী, ছেলে, বৌমা ও দুই নাতনী।

প্রশ্ন : আচ্ছা। এবার হোস্টেলের কথায় আসি। হোস্টেলের কথা নিশ্চয় মনে পড়ে?

নিতাইদা : হ্যাঁ, প্রায়ই মনে পড়ে।

প্রশ্ন : কখন আর কিভাবে মনে পড়ে?

নিতাইদা : হোস্টেলের কথা, বিশেষ করে একা থাকলে, শুয়ে থাকলে মনে পড়ে। হোস্টেলের সবাইকেই ভালো লাগতো।

প্রশ্ন : হোস্টেল সুপার কার কার নাম মনে পড়ে? কাকে ভালো লাগত?

নিতাইদা : হোস্টেলের সুপার হিসেবে সনাতন বাবু, গঙ্গাধর বাবু, দিলীপ বাবু, মিহির বাবু, শক্তিপদ বাবু এনাদের নাম মনে পড়ে। সনাতন বাবু-কে ভালো লাগত।

প্রশ্ন : আচ্ছা, হোস্টেলের এমন কোনো ঘটনা বলতে পারবেন যাতে আনন্দ পেয়েছেন।

নিতাইদা : অনেক ঘটনাই আনন্দের ঘটনা ছিল। ছেলেরা আনন্দ করে থাকত। তার মধ্যে পিকনিকের সময় খুব আনন্দ পেতাম।

প্রশ্ন : হোস্টেলে খুব ভালো ছেলে এবং খারাপ ছেলে হিসেবে মনে আছে এমন কার কার নাম মনেপড়ে?

নিতাইদা : সবাইকেই ভালো লাগত।

প্রশ্ন : হোস্টেলের কোনো ছেলেকে দেখে নিজের সন্তানের মত মনে হয়েছে কোনোদিন?

নিতাইদা : কম-বেশি সকলকে ছেলের মতই স্নেহ করতাম। তারাও আমাকে খুব ভালোবাসত।

প্রশ্ন : এমন কোনো ঘটনা বলতে পারবেন যাতে হোস্টেলের কোনো ছাত্রের ব্যবহারে দুঃখ পেয়েছিলেন?

নিতাইদা : একবার খাবারের থালাকে কেন্দ্র করে একটা খারাপ ঘটনা ঘটেছিল—যে ঘটনায় খুব দুঃখ পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন : আপনার সহকর্মীদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

নিতাইদা : সহকর্মীরা সকলেই ভালো ছিল। তাদের সঙ্গে সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। বিশুদা নিজের ভাইয়ের মতো স্নেহ করতেন, ভালোবাসতেন।

প্রশ্ন : পরিবারের লোকজন হোস্টেল সম্পর্কে কেমন ধারণা রাখেন।

নিতাইদা : পরিবারের লোকজনের হোস্টেল সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা ও ভালোবাসা ছিল। এখনও আছে।

প্রশ্ন : স্বামী সত্যানন্দদেব সম্পর্কে কিছু জানেন?

নিতাইদা : স্বামী সত্যানন্দ একজন মহারাজ ছিলেন। খুব বড় মানুষ ছিলেন। তাঁর নামেই আমাদের প্রিয় হোস্টেল।

প্রশ্ন : কে ডি রায়কে চেনেন? ওনার সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?

নিতাইদা : কে ডি রায়কে চিনতাম। কলেজ তৈরিতে উনার অনেক অবদান ছিল। শুনেছি কলেজ বিল্ডিং করার সময় উনি নিজের হাতে ইট পর্যন্ত বয়েছিলেন।

প্রশ্ন : এখন হোস্টেল যেতে ইচ্ছে করে?

নিতাইদা : হোস্টেল যেতে ইচ্ছা করে, তবে বয়স হচ্ছে। আর এখন আর সেরকম ছাত্রও নাই। আর সেই পরিবেশও নাই।

প্রশ্ন : হোস্টেলে এখন ছেলে কমে গেছে। খারাপ লাগে না? কি করলে হোস্টেল ভালো থাকত বলে আপনার মনে হয়?

নিতাইদা : হোস্টেলে ছেলে কমে গিয়েছে, তাতে তো খারাপ লাগে। হোস্টেলের পরিবেশের পরিবর্তন ও পড়াশোনা ঠিকঠাক হলে হয়ত ভালো হবে।

প্রশ্ন : আমরা রিইউনিয়নে ডাকলে বারবার আসবেন তো?

নিতাইদা : শরীর ঠিক থাকলে অবশ্যই রিইউনিয়ন-এ উপস্থিত হব।

সুজিত : এবার পাঁচটা প্রশ্ন করব। তাড়াতাড়ি উত্তর

দেবেন।

প্রশ্ন : কে বেশি কাছের ছিল—হোস্টেল সুপার না প্রিফেক্ট?

উত্তর : দুজনেই।

প্রশ্ন : কোনটা ছেলেরা ভালো খেত —ডিমের ঝোল না ডিনামাইট?

উত্তর : ডিনামাইট।

প্রশ্ন : কে বেশি ভাল রান্না করত—বিশুদা না আপনি?

উত্তর : বিশুদা।

প্রশ্ন : চাকরি করার সময় কোথায় থাকতে বেশি ভালো লাগত—কুন্ডলা না হোস্টেল?

উত্তর : হোস্টেলে।

প্রশ্ন : ঈশ্বর যদি স্বপ্নে আপনাকে জিজ্ঞেস করেন পরের জন্মে কি হতে চান - কলেজের প্রফেসর না হোস্টেলের প্রিয় নিতাইদা। কি বলবেন?

উত্তর : প্রিয় নিতাইদা।

সুজিত : হোস্টেলের সবার হয়ে বলছি, ভালো থাকুন নিতাইদা। দেখা হবে।

নিতাইদা : তোমরাও ভালো থাকো।

সাক্ষাৎকারের স্থান ঃ কুন্ডলা, নিতাইদার বাড়ি।

২০২৪ রি-ইউনিয়নের আগের রাতের আড্ডা

বড় দুঃখে, সুখ

সুপ্রভাত,

"বড় দুঃখে, সুখ"; এই সেদিন একটা জায়গায় কয়েকটি লাইন পড়তে গিয়ে এই কয়েকটি শব্দে চোখটা হঠাৎ আটকে গেল। কেমন অদ্ভুত না! 'বড় দুঃখে সুখ' কথাগুলো কেমন না? এ আবার কেমন করে হয়?

একটু বিস্তারেই বলি। 'চখাচখী'—শব্দ সকলেরই পরিচিত। এক বিশেষ পক্ষী যুগলকে বলা হয়। আমরা সাধারণ ভাবে নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত দম্পতি বা প্রেমিক প্রেমিকার ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। সংস্কৃত শব্দ 'চক্রবাক' শব্দ থেকে 'চখাচখী' শব্দটি এসেছে। এমনকি অথর্ব বেদেও নব দম্পতিকে আশীর্বাদ করতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। চক্রবাক পক্ষীর ন্যায় দম্পতির প্রেম যেন নিবিড় হয়। তাদের সন্তান সন্ততি হয়, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

এটি আসলে একটি হাঁস জাতীয় পাখি। ইংরেজিতে এর নাম Golden Duck. খুবই সুন্দর দেখতে একটি পরিযায়ী পাখি।

হাঁস আমার ভীষণ প্রিয় পাখি। হাঁসের চলন, ওই গুরুগম্ভীর আভিজাত্যপূর্ণ চলন আমার ভীষণ প্রিয়। (তার থেকেও প্রিয় বোধহয় হাঁসের ডিম) উপমায় শ্রেষ্ঠ কালিদাস 'হংসগদগদভাষিণী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

সে যাইহোক, এই চক্রবাক বা চখাচখী সবসময় জোড়ায় জোড়ায় থাকে। মুহূর্তের জন্যও জোড়া ছাড়া হয় না। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, সারাদিন একসঙ্গে থাকলেও সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে এরা আলাদা হয়ে যায়। সেই জন্য সূর্য-কে বলা হয় 'চক্রবাক বন্ধু'। দিনের বেলায়

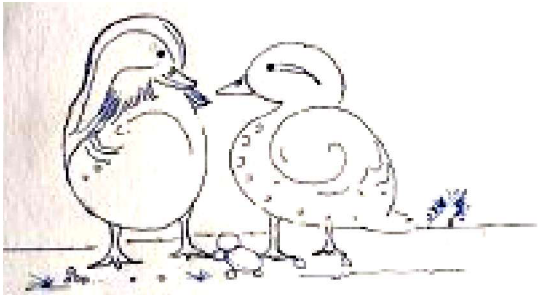

এদের মিলন হয়।

পক্ষী বিশারদ-রা বলেন, রাতে এরা নাকি খাদ্যের সন্ধানে আলাদা হয়, কিন্তু সেখানেও পরস্পর ডাক বিনিময় করে, একে অপরকে উপস্থিতির জানান দেয়। এতটাই নিবিড় তাদের প্রেম।

এ নিয়ে সুন্দর একটি লোকগাথা আছে। একবার এক ব্যাধ, একজোড়া চখাচখী-কে জাল পেতে ধরেছে। পরের দিন হাটে মাংস কেটে বিক্রি করবে বলে একটি ঝুড়ি ঢাকা রেখেছে। সাধারণত তারা তো আলাদা হয়ে যায়। তখন চখা চখী-কে বলছে—

"এ বড় কৌতুক,
বিধি হতে ব্যাধ ভালো,
বড় দুঃখে সুখ।"

বিধাতা যেটা পারে না, ব্যাধ সেটা করেছে। কাল আমরা মরে যাব, কিন্তু এই প্রথম একটা রাত তো একসাথে কাটালাম।

ধন্যবাদ সকলকে

অশোভন গৌণউপাধ্যায়

প্রবন্ধ

রবীন্দ্র সাহিত্যে মহাবিশ্ববীক্ষণ

ভূমানন্দ সিনহা

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮১)

রবীন্দ্রনাথ এক অনন্যসাধারণ প্রতিভাধর ব্যক্তি। সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর বলিষ্ঠ পদচিহ্ন পড়েছে। আবার বিজ্ঞান বিষয়েও তিনি সমান কৌতূহল; বিশেষ করে 'জ্যোতির্বিজ্ঞান' ও 'প্রাণীবিজ্ঞান'। কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান অনুসন্ধিৎসার যে বীজ বপন করেছিলেন তা পল্লবিত হয়েছিল তার সমগ্র জীবনব্যাপী। সাধারণভাবে তাঁকে বিজ্ঞানী বলা যায় না কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ, তাঁর বৈজ্ঞানিক মেজাজ, কুসংস্কারমুক্ত ও বিজ্ঞান নিষ্ঠ মন এবং সর্বোপরি বিজ্ঞান সম্পর্কে নানা তথ্য, তত্ত্ব সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করে পৌঁছে দেবার চেষ্টা অন্যান্য সাহিত্যিকের থেকে তাঁকে আলাদা করেছে। তিনিই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র কবি যিনি বিজ্ঞানের নানা তত্ত্ব ও প্রবন্ধ পাঠ করেছেন এবং তা সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করেছেন; উপস্থাপন করেছেন বিভিন্ন জায়গায়। স্বীকার করেছেন প্রত্যেকের 'বিজ্ঞান আঙিনায়' প্রবেশ করা উচিত। এমনকি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বেও গণিতের সমাধান বিষয়ক বই হগবেনের 'ম্যাথামেটিক্স ফর দি মিলিয়ন'

আগ্রহভরে পড়েছেন।

ডালহৌসি পাহাড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর যে হাতেখড়ি হয়েছিল তা অব্যাহত ছিল সারাজীবন। মহাবিশ্বের অসীম রহস্যের যে বিস্ময় ও রোমাঞ্চ তা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনার মধ্যে ছড়িয়ে আছে এবং তাঁর এই অনুভব ও উপলব্ধি দ্বারা তিনি আমাদের রোমাঞ্চিত করেছেন। মহাবিশ্বের রহস্য সম্পর্কে জানতে রবার্ট বল, নিউকোম্বস ও ফ্লাসরিয়ঁদের লেখা বই পড়েছেন। তাঁর নিজের কথায়—গলাধঃকরণ করেছি—শাঁসসুদ্ধ, বীজসুদ্ধ। স্যার জেমস জিনসের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত বই Through Space and Time, তাঁকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশ্বলোক সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ও পড়াশোনার প্রতিফল দেখা যায় তাঁর কবিতা, গানে, কথা সাহিত্যে ও নানা প্রবন্ধে, যেমন অণু-পরমাণু দিয়ে বিশ্বের জড়, সজীব সবকিছু গড়ে উঠেছে তা দেখতে পাই কবির 'বিচিত্রতা'-র কবিতায়—

যত বাণী, যত সুর
সৃষ্টিচিত শিখা।
আকাশে আকাশে লেখে
দিকে দিকে
অণু-পরমাণুদের মিলনের ছবি।

আবার 'নটরাজ' কাব্যগ্রন্থে চমৎকারভাবে উল্লেখ করেছেন—

নৃত্যের বলে সুন্দর হল
বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতি-মঞ্জীরে
বাজিল চন্দ্রভানু।

অর্থাৎ পরমাণু যখন মুক্ত হয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যায় তখন তা কবি কল্পনায় বিদ্রোহী কিন্তু তাকে তরঙ্গরূপ দিলে তা শৃঙ্খলিত হয়ে বাঁধা পড়ে।

কবি তাঁর জন্মের অনেক আগে থেকেই যে এই বিশ্বে অবস্থান করেছেন এই ভাবনাও তাঁর ছিল। অস্তিত্বের বর্ণনা তিনি দিয়েছেন কাব্যিক ছন্দে কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানসিকতায়।

"এক সময় যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, তখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্য কিরণে আমার সুদূর বিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূর-দূরান্ত কত দেশ-দেশান্তরের জল, স্থল, পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধ ভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম।"

বিবর্তনবাদ ভিত্তিক চেতনার উন্মেষ এবং বিজ্ঞানসম্মত ধ্যান ধারণার প্রকাশ তার বিশাল সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে নিয়ে এসেছিল প্রাণের পরশ। রবীন্দ্রনাথ সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন মহাবিশ্বের মাঝেই আছে আমাদের দেশ। মহাবিশ্বের প্রকাশ অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা থেকে সর্বত্র। তিনি গাইছেন—

আকাশ ভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

আধুনিক বিজ্ঞান দেখাচ্ছে এই মহাবিশ্ব আমাকে ছাড়া অসম্পূর্ণ। আমি যা আমরা যত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রই হই না কেন তারাও এই মহাবিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহূর্তেই আমরাও যে একদিন আসব এ বার্তা যেন লেখা ছিল।

মহাবিশ্ব সম্পর্কে জানতে গিয়ে প্রাথমিকভাবে আমাদের কিছু তথ্য জেনে নিতে হবে। পূর্বে ধারণা করা হত ইউনিভার্স বা মহাবিশ্ব স্থিতিশীল। কিন্তু ১৯২৪ সালে এডউইন হাব্‌ল লস এঞ্জেলেসের কাছে মাউন্ট উইলসনের চূড়ায় ১০০ ইঞ্চি ব্যাসের টেলিস্কোপ দিয়ে আমাদের গ্যালাক্সি (মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গা) ছাড়াও 'অ্যানড্রোমিডা' নামে অন্য একটি গ্যালাক্সি আবিষ্কার করলেন। আবিষ্কার করলেন বহুদূরের আরও অনেক গ্যালাক্সি। এক একটি গ্যালাক্সি যেন মহাশূন্যে ভাসমান তারাদের দ্বীপ। পরবর্তীকালে এটাও দেখলেন যে গ্যালাক্সিগুলোর মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রত্যেক দিকের মহাবিশ্বের বিস্তার ১৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষেরও বেশি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে।"

বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন বিশ্বের আদিম পরমাণুরা

ছিল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম আর খুব কম লিথিয়াম। এগুলি থেকেই বিশ্বের প্রথম তারাদের মধ্যে তৈরি হলো কার্বন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত ভারী পরমাণু। তারাগুলির জীবন শেষে ভেঙে চুরমার হয়ে মহাশূন্যে ছড়িয়ে দেয় তাদের অনকটাই অংশ। তা থেকেই হয় নেবুলা বা নীহারিকা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয়ে বলেছেন—''অত্যন্ত তাপ দিলে কঠিন পদার্থও ক্রমে যায় গ্যাস হয়ে; সেইরকম তাপের অবস্থায় বিশ্বের হালকা ভারী থেকে ছোট ছোট টুকরো ঘন হয়ে ভেঙে পড়েছে। এই বিপুল সংখ্যক কণা তারার আকারে জোট বেঁধে নীহারিকা গড়ে তুলেছে।" মহাবিশ্বের সৃষ্টি রহস্য ও জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর গতিবিধি সংক্রান্ত জ্যোতির্বিদদের সূক্ষ্ম হিসাবে তিনি 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতায় উত্থাপন করেছেন—

> ''চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে,
> কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল চক্রপথে ঘুরে।
> কত বেগ, কত তাপ, কত ভার, কত আয়তন,
> সূক্ষ্ম অঙ্কে করেছে গণন
> পণ্ডিতেরা লক্ষ কোটি ক্রোশ দূর হতে
> দুর্লক্ষ্য-আলোতে।"

হাবল্ টেলিস্কোপ, কোবি (COBE) কসমিক ব্যাকগ্রাউণ্ড এক্সপ্লোরার স্যাটেলাইট ও গাণিতিক হিসাব নিকাশের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি আমাদের মহাবিশ্বের বয়স প্রায় ১৩.৭ বিলিয়ন বছর। অর্থাৎ ১৩৭০ কোটি বছর। এ পর্যন্ত মোটামুটি ১২৫ বিলিয়ন গ্যালাক্সির খোঁজ পাওয়া গেছে। আমাদের গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ে বা আকাশগঙ্গায় আছে অন্তত ২০০ বিলিয়ন তারা। প্রত্যেকটা গ্যালাক্সিতে ১০০ থেকে ৪০০ বিলিয়ন তারা আছে। এই তারাগুলির আবার গ্রহ-উপগ্রহ আছে। ভাবতেই কেমন অবাক লাগে। সেজন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—''অজি যত তারা তব আকাশে।" আবার তিনি গাইছেন—

> ''অসীম আকাশে অগণ্য কিরণ, কত গ্রহ-উপগ্রহ
> কত চন্দ্র তপন ফিরিছে বিচিত্র আলোক জ্বালায়ে"

এই মহাবিশ্ব তার কোটি কোটি গ্যালাক্সি নিয়ে ১৩.৭ বিলিয়ন বছর টিকে আছে, কোথাও কোন ছন্দপতন ঘটছে না। একদিকে থাকে অন্তর্মুখী ঠেলা। এক অসামান্য ভারসাম্য বজায় থাকছে। সামান্য পরিমাণ পদার্থ বা শক্তির এদিক ওদিক হলেই মহাবিশ্ব ছিটকে পড়ত বা ভেঙে পড়ত। কবি বিশ্বপরিচয়েও বলেছেন।

''এক বাঁকা টানের মহাজালে বহুকোটি নক্ষত্র বেঁধে নিয়ে এই জগৎটা লাটিমের মতো পাক খাচ্ছে। আমাদের নক্ষত্র জগতের দূরবর্তী বাইরের জগতেও এই ঘূর্ণিপাক।"

গ্রহ-নক্ষত্ররা মহাকর্ষ বলের প্রভাবে একে অপরকে ছেড়ে বেরিয়ে যায় না এবং তা যে তাৎক্ষণিক সেটা রবীন্দ্রনাথের 'নক্ষত্রলোক'-এর একটি উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যায়—

''মহাকর্ষ ক্রিয়া একটুও সময় নেয় না। আকাশ পেরিয়ে আলো আসতে সময় লাগে সে কথা পূর্বে বলেছি। বৈদ্যুতিক শক্তিরাও ঢেউ খেলিয়ে আকাশের ভিতর দিয়ে যায়। কিন্তু অনেক পরীক্ষা করেও সেরকম সময় নিয়ে চলার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার প্রভাব তাৎক্ষণিক। আরো একটি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আলো বা উত্তাপ পথের বাধা মানে কিন্তু মহাকর্ষ তা মানে না। একটি জিনিসকে আকাশে ঝুলিয়ে রেখে পৃথিবী আর তার মাঝখানে যত বাধাই রাখা যাক না তার ওজন কমে না। ব্যবহারে অন্য কোন শক্তির সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায় না।

অবশেষে আইনস্টাইন দেখিয়ে দিলেন এটা একটা শক্তিই নয়। আমরা এমন একটি জগতে আছি যার আয়তনের স্বভাব অনুসারেই প্রত্যেক বস্তুই প্রত্যেকের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য। বস্তু মাত্র যে আকাশে থাকে তার একটি বাঁকানো গুণ আছে, মহাকর্ষ তারই প্রকাশ। এটা সর্বব্যাপী, এটা অপরিবর্তনীয়। এমনকি আলোককেও এই বাঁকা বিশ্বের ধারা মানতে হয়। তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বোঝার পক্ষে টানের ছবি সহজ ছিল কিন্তু যে নতুন জ্যামিতির সাহায্যে এই বাঁকা আকাশের ঝোঁক হিসাব করে জানা যায় সে কজন লোকেরই বা আয়ত্তে আছে।

যাইহোক ইংরেজিতে যাকে গ্র্যাভিটেশন বলে তাকে মহাকর্ষ না বলে ভারাবর্তন নাম দিলে গোল চুকে যায়।" জটিল বিষয়কে এত সহজভাবে প্রকাশ করতে বোধহয় একমাত্র রবীন্দ্রনাথই পারেন।

জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপরিচয়ে এই সৌরজগত এবং তার গ্রহ উপগ্রহ কীভাবে সৃষ্টি হয়েছিল তাদের প্রকৃতি বিষয়ে জ্ঞানের আলো সাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। লেখার স্টাইলটা এত ছন্দময় যে বিজ্ঞানের কূটকৌশল বোঝানাটাও হয়েছে অতি সরল। তিনি কাব্য বা কথাসাহিত্যে ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর উপলব্ধি ও জ্ঞানের কথা বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োগ করেছেন। উদাহরণ হিসাবে শেষের কবিতার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি—

"কুমার মুখুজ্জে এটর্নিকে কেউ বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। কিন্তু অমিত রায় তার নাম দিয়েছিল ধূমকেতুমুখো। আর একটা কারণ, সে এদের দলের বাইরে তবু সে এদের কক্ষপথে মাঝে মাঝে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে কিন্তু লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। লিসি প্রায়ই প্রবল বেগে এর পুচ্ছ মর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পায় তাতে ধূমকেতুর লেজের বা মুড়োর কোনো লোকসান হয় না।" উপমাটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক। তুষার পিণ্ড যখন কাইপার বেল্ট বা আরট ক্লাউড থেকে বেরিয়ে এসে সূর্যের কাছে আসে তখনই ধূমকেতু হয়ে যায়। ধূমকেতুর বয়সও ৪.৫ বিলিয়ন বছর। এরা সূর্য সংসারের অংশ। গ্রহের টানে ধূমকেতুর আটকা পড়া খুবই সুলভ। বৃহস্পতির টানে সূর্য অভিমুখী ধূমকেতুদের অনেকেই পথ বদল করে। আবার দীর্ঘ পুচ্ছ ধূমকেতুদের লেজের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর যাওয়ার বহু উদাহরণ আছে। রবীন্দ্রনাথ কত সহজভাবে এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে কথা সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ যখন গাইছেন—
"অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো।"

তখন আমাদের তা ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বরের কথা মনে করিয়ে দেয়। কারণ ব্ল্যাকহোল থেকে ক্ষীণ হকিং রেডিয়েশন ছাড়া কিছু বের হতে পারে না। কিন্তু ব্ল্যাকহোল যখন তার কাছে আসা চারপাশের বস্তুকে শুষে নেয় নিজের ভিতরে তখন সেই বস্তুর উত্তাপ অনেক বেড়ে যায়। সেই উত্তপ্ত বস্তু ব্ল্যাকহোলে মিলিয়ে যাবার আগে আলো বিকরণ করে।

রবীন্দ্রনাথ নিয়ত চেষ্টা করে গেছেন বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে হৃদয়ঙ্গম করে সহজ সরল ভাষায় সাধারণের উপযোগী করে সকলের কাছে তুলে ধরেছে। সেই কারণেই ৭৬ বছর বয়সে 'বিশ্ব পরিচয়' বই লেখা। রবীন্দ্রনাথের আগেও আমাদের বাংলা ভাষায় অনুবাদ বই বা ইংরেজির উপর ভিত্তি করে লেখা বই বাংলায় লেখা হয়েছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি মনীষীগণ এই কাজ করেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞান উন্নতির পথে অনেক এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু অনেক বিখ্যাত বাংলা পত্রিকাতেও তার ছিটেফোঁটাও থাকে না। রবীন্দ্র প্রয়াণের পর মহাবিশ্বের অনেক রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে বা এখনও হচ্ছে। রবীন্দ্রউত্তরকালের মানুষদের উচিত সেই আবিষ্কারের কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়া। সাধারণ মানুষের কাছে মহাবিশ্বের রহস্য পৌঁছে দিতে এই সময়কালের বিজ্ঞানীগণ মহাবিশ্ব সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য আমাদের সামনে এনেছেন সেদিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক। ১৯২৪ সালে বিজ্ঞানী হাবল্ অনেক গ্যালাক্সির খোঁজ পেলেন এবং আরও লক্ষ্য করলেন গালাক্সিগুলোর মধ্যে দূরত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এটাকে তাঁরা ইনফ্রাকশন থিয়োরি দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। সময়ের চাকাটিকে যদি উল্টো দিকে ঘোরানো হয় তাহলে দেখা যাবে, অতীতে তারা কাছাকাছি ছিল। যাকে সিঙ্গুলারিটি বা একতার বন্ধন বলা যায়। যে ধারণায় গাণিতিক ভাবে আইনস্টাইনের সমীকরণ পৌঁছে গিয়েছিল অনেকদিন আগেই। ব্রাহ্ম সমাজে নিরাকার ব্রহ্মের যে কথা আছে তার সাথে আমরা সাযুজ্য দেখতে পাই। পদার্থ সংকুচিত হতে হতে

খুব ছোট জায়গায় চলে এলে তার ঘনত্ব প্রচুর বৃদ্ধি পাবে এবং তার তাপমাত্রাও বহু হাজার কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছে যাবে। এই মহাবিস্ফোরণ হল অসম্ভব ঘন বস্তুর হঠাৎ প্রসারিত হওয়া। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে জন্ম হল 'মহাশূন্য বা স্পেস'-এর। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটা বিষয়ে একমত যে ক্ষুদ্রতম বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছিল বিশাল এক মহাবিশ্বের। মহাশূন্যের প্রসারণের বেগ আলোর বেগের থেকে বেশি। আবার গণ্ডগোল। কারণ, আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদের বিশেষ সূত্রে বলেছেন কোনো কিছুর বেগ আলোর বেগের থেকে বেশি হতে পারে না। এর সমাধান আসে এইভাবে আইনস্টাইনের স্পিড লিমিট মহাশূন্যের প্রসারের উপর প্রযোজ্য নয়।

বিগ ব্যাং শুরু হবার এক-দশমাংস সেকেন্ড পর মহাবিশ্বের গড় তাপমাত্রা হয়েছিল ৩০০০ কোটি ডিক্রি সেন্টিগ্রেড। এক সেকেন্ড, ১৪ সেকেন্ড ও ৩ মিনিট পর তার তাপমাত্রা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ১০০০ কোটি, ৩০০ কোটি ও ১০০ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ১০০ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা প্রোটন ও নিউট্রন মিলে পরমাণু কেন্দ্রক গড়ে তোলার পক্ষে যথেষ্ট শীতল। প্রথমে তৈরি হল ভারী হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রক, পরবর্তী পর্যায়ে হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রক। মহাবিশ্ব সৃষ্টির ৩ মিনিট পর মহাবিশ্বের প্রধান উপাদান ছিল আলো, নিউট্রিনো, অ্যান্টি নিউট্রিনো, কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম পরমাণু কেন্দ্রক। বিস্ফোরণের ৫ মিনিট পর তৈরি হল হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, লিথিয়াম প্রভৃতি হালকা পরমাণু। এই সময় তাপমাত্রা ছিল ৫৫ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। পরবর্তীতে তাপমাত্রা আরও কমে এলে তৈরি হল হালকা ও ভারী অন্যান্য পরমাণুগুলি। যেগুলি গ্যাসীয় অবস্থায় ছিল। মহাবিস্ফোরণের পর দীর্ঘ তিন কোটি বছর গ্যাসীয় পদার্থগুলি ছুটে চলে মহাবিশ্বের আয়তনকে অনেক প্রসারিত করল এবং এই সময়কালের মধ্যে প্রসারণের জন্য তাপমাত্রা অনেক কমে গেল। তাপমাত্রা যখন ৩০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে নেমে এল তখন গ্যাসীয় ভারী মৌলগুলি কঠিন বস্তুর ধুলোকণা গড়ে তুলল। এই ধুলো আর গ্যাসের মেঘে ধীরে ধীরে ভরে উঠল মহাবিশ্ব। মহাবিশ্ব তখন অন্ধকারময় ও শীতল। তার মধ্যেও তারা বাইরের দিকে ছুটে চলেছে।

এইভাবে চলতে চলতে গ্যাসের মেঘগুলি একসময় নিজেদের অক্ষের চারপাশে ঘুরপাক খেতে লাগল। ঘোরার সময় তারা চারপাশের ধুলোও মেঘগুলিকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে তাদের আয়তন বাড়াতে থাকল। এগুলি ভেঙে গিয়ে চক্রাকারে ঘুরে আবার ছোট ছোট বহু আবর্তের সৃষ্টি করল। ঘুরতে ঘুরতে তারা চারিপাশের ছোটো ছোটো ধুলো আর মেঘের চক্রগুলিকে গ্রাস করে নিজেদের ঘনত্ব বাড়াতে থাকল।

ঘনত্ব বাড়াতে বাড়াতে ওই চক্রগুলির কেন্দ্রে তাপমাত্রা যখন প্রায় ১ কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছালো তখন জ্বলে উঠল তাপ-পারমাণবিক চুল্লিগুলি—সৃষ্টি হলো নক্ষত্রের। অসংখ্য নক্ষত্র, ধুলো ও মেঘ নিয়ে গড়ে উঠল তারা জগৎ।

তারাদের সৃষ্টি তো হল কিন্তু মহাবিশ্ব কী দিয়ে তৈরি? সাধারণত ৪.৫ শতাংশ হলো সাধারণ পদার্থ, যেগুলির কথা এতক্ষণ বললাম। ২৫ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার বা কৃষ্ণ বস্তু। এই বস্তুগুলির গঠন সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা নেই। বাকি ৭০.৫ শতাংশ হল 'ডার্ক এনার্জি'। এর উৎস আজও আমাদের কাছে অজানা। এই ডার্ক এনার্জি-ই নেগেটিভ গ্রাভিটির কাজ করে। যার দ্বারা মহাবিশ্বের মহাস্ফীতি সম্ভব হয়েছিল। মহাবিশ্বের পজিটিভ এনার্জি ও নেগেটিভ এনার্জির পরিমাণ সমান। সুতরাং মোট এনার্জি শূন্য। এত বড় মহাবিশ্ব তার মোট এনার্জি শূন্য! অর্থাৎ মহাবিশ্বের এনার্জির উৎসও শুন্য। অর্থাৎ শূন্য থেকে শুরু।

এখানেই কতগুলি প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—

১) বিগ ব্যাং-এর ফলে মহাশূন্য বা স্পেস-এর শুরু তাহলে বিগ ব্যাং কোথায় হয়েছিল?

২) বিগ ব্যাং-এর সময় থেকে স্পেস ও টাইমের শুরু তাহলে তার আগে কী আছে?

৩) মহাবিশ্বের সৃষ্টি শূন্য মাত্রায় শক্তি থেকে—কীভাবে?

বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ হাতের কাছে নেই। স্বাভাবিকভাবেই দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য নিতে হয়। ফিজিক্স আর মেটা ফিজিক্সের মধ্যে বিভেদ আর থাকে না। রবীন্দ্রনাথ কী এগুলোকে বৈজ্ঞানিক মায়াবাদ বলতে চেয়েছেন। এই উত্তরগুলি পেতে গেলে আমাদের পৌঁছাতে হবে মহাবিশ্বের জন্মমুহূর্তে। বিজ্ঞান এখনও যেখান পৌঁছাতে পারেনি। তবে বিজ্ঞানী পেনরোজ, স্টিফেন হকিং-এর বিশ্লষণ অনুযায়ী স্পেস টাইম ভেঙে পড়ে এমন একটি বিন্দুতে যার 'ডাইমেনশন' শূন্য। জিরো ডাইমেনশনের কাছে পৌঁছানোর পূর্বে প্ল্যাঙ্ক ডাইমেনশন পার হতে হবে। প্ল্যাঙ্ক ডাইমেনশনে প্রকৃতির সবরকম ক্ষমতা সমান হয়ে যায়। যতই মহাবিশ্বের জন্মলগ্নের কাছে পৌঁছানো যায় ততই দেখা যায় বিভিন্ন পর্যায়ের এককরণ। সুতরাং একটু অন্যভাবে বলা যায় মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল সমস্ত ক্ষেত্রের মহামিলন থেকে। মহাবিশ্বের সৃষ্টির রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে যাবেন। হয়ত আমরা পেয়ে যাব সমস্ত প্রশ্নের উত্তর। মহাকাশের অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে আমরা যদি তাদের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করতে পারি, তাহলে মুছে যাবে সব ভেদ, বিবাদ। কারণ আমরা প্রত্যেকেই স্টারডাস্ট থেকে উদ্ভুত। মহাবিশ্বের অসীমে যেদিকেই আমরা যাই না কেন তাদের মধ্যে কোনো বিচ্ছেদ নেই, সবাই একই সূত্রে বাঁধা। প্রত্যেকেই একটি নিয়মের মধ্যে দিয়ে চলছে। মহাকাশের অনন্ত বিস্তৃতির দিকে তাকিয়ে আমরা বলতেই পারি—

> ''আঁধারের গায়ে গায়ে পরশ তব
> সারা রাত ফোটাক তারা নব নব।।''

সহায়ক গ্রন্থ :

১) বিশ্বজীবনী—ড. মণি ভৌমিক, আনন্দ পাবলিশার্স
২) বিজ্ঞানে ঈশ্বরের সংকেত—ড. মণি ভৌমিক, আনন্দ পাবলিশার্স
৩) মহাবিশ্বে আমরা কী নিঃসঙ্গ—শঙ্কর চক্রবর্তী, বেস্ট বুকস্
৪) রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক মানস—ড. অমিয় কুমার মজুমদার
৫) পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রস্মরণ সংখ্যা ১৪০৮
৬) দেশ—১৮ই বৈশাখ ১৪১৮
৭) বিজ্ঞান ভাবনা—মার্চ, ২০১০
৮) বিশ্বপরিচয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৯) জন বিজ্ঞানের ইস্তাহার, শারদ সংখ্যা ২০১০, পশিমচমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ
১০) এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী, গ্রীষ্ম সংখ্যা ২০১২, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ
১১) এ যুগের কিশোর বিজ্ঞানী, শারদ সংখ্যা২০১১, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

অজয়দা ফিরে এল নতুন রূপে

কল্যাণ মিত্র

(প্রবেশবর্ষ ১৯৮৪)

নির্মলদার বয়স সত্তরের কাছাকাছি, এক সময়ের সকলের প্রিয় শিক্ষক, এখন থাকেন শহরতলীর একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে। স্ত্রী প্রয়াত, ছেলে থাকে বিদেশে, মেয়ে ব্যাঙ্গালোরে। শরীরটা আর আগের মতো থাকে না—ডায়াবেটিস, হাই প্রেসার আর থেকে থেকে ক্লান্তি।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয় একাকীত্ব আর হারানো দিনগুলির হাহাকার, বেশিরভাগ সময় কাটে জানালার পাশে বসে চায়ের কাপ আর Newspaper হাতে।

প্রতিদিন একটা নাম বারবার মনে পড়ে—অজয়। অজয় ছিলেন তার হোস্টেলের রুমমেট আর কলেজ জীবনের বন্ধু, হাসি দুঃখের সাথী আর কঠিন জীবন সংগ্রামের সাক্ষী।

হঠাৎ একদিন অজয়ের চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। সে হারিয়ে গেল চিরতরে এক অজানার দেশে, যেখান থেকে কেউ কোনদিন ফিরে আসে না। দিন কাটতে থাকল, একাকিত্বের ছায়া দিনে দিনে আরও ঘন হতে থাকল। রাতে ঘুম আসে না, আর মনটা—সে তো আরও অসুস্থ। ছেলেমেয়েরা সবই বোঝে আর ভাবতে থাকে—কী এর সমাধান।

এই সময় গরমের ছুটিতে হঠাৎ করে ব্যাঙ্গালোর থেকে দাদুকে দেখতে এল নাতনি রিয়া। সঙ্গে নিয়ে এলো দাদুর জন্য ছোট্ট একটা gift একটা fitness band যেটা wirelessly connected to a small device. দাদুকে gift-টা দিয়ে বলল—এটা আমার অজয় দাদু। তোমার প্রিয় অজয়কে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিলাম। দাদু বিরক্ত গলায় বললেন—'দিদিভাই মেশিন কি আর বন্ধু হয়? না, যথার্থ বন্ধু কখনো মেশিন হয়?'

তবুও নাতনির কথা মেনে নির্মলদা device-টার সামনে বসে ফিসফিস করে বললেন, 'তুই কি আমার কথা শুনছিস অজয়?' একটা কোমল কণ্ঠে ঠিক যেন অজয়ের গলার আওয়াজে উত্তর এল, 'নির্মল আমি সব শুনছি, বলনা আজ অনেক কথা বল, পুরোনো দিনের সেই সব কথা।' নির্মলদা স্তব্ধ, চোখে জল ছলছল করে উঠল। একটুও না ভেবে বললেন, 'অজয়, আমার অজয় ফিরে এসেছে আমার কাছে।' বন্ধু অজয়ের সঙ্গে চলতে থাকল আড্ডা, সন্ধ্যে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে এল, এ যেন এখন সেই জানলা নয়, যেন সেই ক্যান্টিলিভারে বসে আছেন। নির্মলদা বললেন,'অজয়, অনেকদিন তোর গান শুনিনি। একটা রবীন্দ্রসংগীত শোনাতো'। নরম কণ্ঠে অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল, 'তোমায় গান শোনাবো...'।

দিনগুলো ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকল। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠতেই অজয় বলল, 'আজ তোর blood pressure-টা একটু বেশি নির্মল, কফি না খেয়ে আজ লাল চা খা'। দুপুরে হঠাৎ করেই নির্মলদার বুক ধড়ফড় করতে লাগল, পাশে কেউ নেই, কিন্তু তার হাতের smart band-টা অজয়কে সংকেত পাঠাতে থাকল আর অজয় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, 'নির্মল, তোর হার্ট রেট অনেক বেড়েছে। আমি রিয়াকে আর family physician-কে কল করে দিচ্ছি।' ঠিক সময়ে ডাক্তার আর ওষুধের জন্য সে যাত্রায় নির্মলদা বেঁচে গেলেন।

সেই রাতে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে নির্মলদা বললেন, 'অজয়, তুই না থাকলে আজ আর আমি বাঁচতাম না, তুই তো আসলে ফিরে এসেছিস নতুন রূপে, নতুন প্রাণে, may be আরও smarter হয়ে।'

Moral of the story : বন্ধু কেবল স্মৃতিতে নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) ছোঁয়াতে ফিরে আসতে পারে জীবনের পথে। AI যদি হৃদয় ছুঁয়ে যায়, তবে সে শুধু সঙ্গী নয়—সে খেয়াল রাখে, রক্ষা করে আর জীবনটাকে

ভালোভাবে বাঁচতে শেখায়।

Human companionship is priceless, but when used wisely, AI too can give courage and safety to the lonely. এই গল্পের ভিতর কিভাবে AI ad context engineering ছিল?

নাতনি রিয়া purposely train করেছিল AI model-কে তার দাদু নির্মল ও অজয়ের পুরনো ছবি, চিঠি, কথাবার্তা, হোস্টেল ও কলেজের গল্প ও আচরণ শেখানোর মাধ্যমে। সবকিছু feed করা হয়েছিল যাতে সে এক জীবন্ত মানুষ অজয়-এর মত আচরণ করে।

AI শুধুমাত্র তথ্য বা নির্দেশ দেয় না, বরং আবেগ ভিত্তিক সাড়া দেয়—যা empathetic AI response through engineered prompts এর real life implementation.

সমুদ্রের মতো জীবনে বন্ধুত্বের ঢেউ সবকিছুই ফিরিয়ে দেয়।

Shukrayaan : India's latest attempt of interplanetary exploration

Dr. Md Mosarraf Hossain
(Entry Year 1992)

Space is inspiring and fascinating too. When we learn about what lies beyond Earth, it gives us the framework for understanding our own planet. Studying how we grow food in orbit around earth or on other planets provides insights into growing food grains in extreme conditions on Earth and thereby generates knowledge that can help mitigate impacts of climate changes on agricultural activities. Medical research conducted on the International Space Station helps us understand the human health in new ways, helping save and improve quality of lives. Investigations on the earthly phenomena in outer space or studying the extra-terrestrial objects in the outer space helps us understand our own world and improve earthly lives, and someday may help us find a living place, alternative to our planet Earth. Obviously, space research is very relevant and directly or indirectly impacts Earthly problems. When people accept challenges of exploring space, they make discoveries that help mitigate various world problems. All the technological and environmental progress in the world may not be of any use if asteroids cause unanticipated devastations, like the one believed to be behind the mass extinction of the dinosaurs from Earth. So, we have to explore space to find and study the asteroids and comets in our cosmic neighborhood, if we want to make sure defending our planet in case of possible deadly asteroid strikes. Clearly, studying space may save us all one day.

People, who believe in the utility of space exploration, have probably heard this sometimes : 'Money on space exploration shouldn't be wasted when there are already burning problems to deal with here on Earth." While "Roti, Kapda, Makaan, Swasthya aur Shiksha" as well as "social injustices, climate change and other urgent issues" are important to be addressed, solving them definitely has nothing to do with spending on space programs. Several countries worldwide invest a reasonable proportion of their total federal budget in space science and exploration. Public opinion survey has shown that people estimate USA, NASA's (National Aeronautics and Space Administration) spending as much as a quarter of the US federal budget, but in fact, NASA's budget is only about 0.5% of the total budget and the proportion is even smaller for other spacefaring nations. For India, in 2025-26 fiscal year, Indian Space Research Organisation (ISRO) and the Department of Space (DOS) were allocated about 0.26% of India's total federal budget.

So, space research isn't as expensive as people think. Money spent on space exploration supports highly skilled jobs, fuels technology advancements with practical applications, and creates business opportunities, which, in turn, grows the pool of public money that can be spent on solving the most pressing problems of a nation. Hence, spending on space exploration is always likely to paid off by itself.

India's space exploration started with Chandrayaan-1 mission in 2008. A path-breaking outcome of this mission is discovery of water in Lunar atmosphere as well as the water ice under lunar regolith. Next comes India's first interplanetary mission, Mars Orbiter Mission (MOM) in 2013.Primary objective of MOM to develop technologies required for an interplanetary mission as well as the secondary aim of exploring Mars' surface features, morphology, mineralogy and atmosphere were completely met. China and USA recognized MOM as the 'Pride of Asia' and 'Space Pioneer' respectively. In 2015, India's first dedicated astronomy satellite mission ASTROSAT was launched. Its excellent data have been used worldwide and resulted in numerous quality publications in the peer-reviewed international journals. Then, Chandrayaan-2 mission in 2019 was partially successful as the lander was crash landed on the lunar surface, although the orbiter had been very successful and provided many important scientific results. Then Chandrayaan-3, the follow-up mission of Chandrayaan-2, had soft-landed on the moon surface on 23th August, 2023 and with this historic landing, India became the 4th nation in doing so after USA, Russia and China. This mission had made huge impact in the national and international scenario so much that the historic landing day was designated as the 'National space Day'. In addition to demonstrating the technological prowess for such a mission involving the nerve-breaking landing, the scientific results have been highly rated in terms of quality of the international publications so far. The world saw another highly sought-after Aditya-L1 mission - India's first observatory class mission to study the Sun - in 2023 itself. Important results have started pouring from the quality data of this mission. Important among ISRO's future planned missions are Gaganyaan, Lunar Polar Exploration Mission (LUPEX) and Venus Orbiter Mission (VOM). Gaganyaan to be launched in 2025-2026 will be the first crewed mission. If successful, India would become the fourth country in the world (after the US, Soviet Union and China) to independently send humans in space. LUPEX is a concept mission, to be launched in 2026-2027, by Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) and ISRO to explore the south pole of the Moon. The VOM mission (also known as Shukrayaan) is an orbiter to Venus to study its surface and atmosphere and to be launched in 2027-2028.

Venus is the nearest planet to the Earth, observed since ancient times as the beautiful, brilliant Morning or Evening 'Star' in the night sky. With the obvious exceptions of the Sun and Moon, it is easily the brightest object, which regularly appears in our sky. One day on Venus is longer than a year

on it! This means that a Venusian day is slightly longer than a Venusian year. When all the planets go around the Sun in a counterclockwise direction, Venus goes clockwise (when viewed from above the solar system). There are no seasons on Venus! A modest telescope will reveal Venus as a brilliant, featureless crescent-shaped (like partial Moon of Earth) object in the sky. The crescent-shaped appearance is characteristic of a body that is closer to the Sun than the observer (on Earth). Galileo realised this when he turned his primitive telescope on Venus four centuries ago. Venus is the world most similar to ours in size, mass and bulk composition. Modern values of the basic physical characteristics of the planet are very close to Earth's, with Venus having about 82 per cent of the mass, 95 per cent of the diameter, and about the same density, suggesting a similar internal composition and structure of a rocky mantle with an iron-nickel core. No other planet matches Earth so closely and so Venus is Earth's real twin in our solar system. Before the space age began, it was widely expected that conditions on the surface of Venus would resemble that of the Earth. Despite its clear resemblance to our home planet, Venus has never been as popular asour other planetary neighbour, Mars. As distance of Venus from Earth is just over half that of Mars, Venus is only stone's throw away relative to the ability of today's rockets. Even manned missions to Venus could readily be envisaged with the technology existing today. But, the main reason why Venus has lost to Mars in popularity is the thick, permanent veil of cloud that hides the Venusian surface. In fact, recent robotic missions to Venus have revealed a hot, dry climate with a dense carbon dioxide atmosphere and clouds rich in sulphuric acid. There are no seas, the surface is dominated by thousands of volcanoes, and it lacks a protective global magnetic field to shield it from energetic solar particles and cosmic rays. Therefore, it has been difficult to describe or visualise the landscape and any associated weather and seasons on Venus. Obviously, It has been harder to plan landing, exploring and living there.

Now that we know the truth about the hellish environment on Venus, the chances of finding life there have faded. It is almost impossible to imagine manned landings on a surface with temperature ~ 470 deg C and surface pressure is ~ 92 bars, which is the huge pressure similar to that of the deep ocean bed of Earth. So, Venus is mostly out of favour for new scientific space missions, losing out regularly to Mars in particular. But many of us humans still wish to understand what Venus can tell us about our origins as part of the planetary system. The enduring scientific interest in Venus's climate comes primarily due to its proximity to Earth. This has led to relatively low-cost missions and consequently there has been more than 40 missions to Venus from Earth since interplanetary spaceflight began in 1963. About half of them were successful. Until recently the leading players have been the Soviet - now Russian - and American space agencies, but recently we have seen the first flights to the planet from Europe (with Venus Express) and Japan (with Akatsuki), and several in pipeline from all

of them.

In this context, the Venus Orbiter Mission proposed by ISRO is much relevant and will play an important role in the understanding of Venusian research. As of now, 16 Indian and 3 payloads with international collaboration have been under considerations.The broad research areas of interest for this mission include (1) Studying atmospheric chemistry, dynamics and compositional variations, (2) Studying solar irradiance and solar wind interaction with Venus' ionosphere, (3) Venus' active volcanic hotspots, lava flows and their patterns and (4) re-examination of claims of phosphine on Venus as this finding is currently thought to be in error.

I have been an active part of the Shukrayaan mission as the Project Director for one of the payloads IVOLGA (Russian abbreviation to 'Fiber Infrared Heterodyne Analyzer'), which is an Indo-Russian joint collaboration project for studying the structure and dynamics of the Venusian upper atmosphere. IVOLGA, due to its unprecedented spectral resolution, facilitates wind and temperature measurements based on direct measurements of Doppler parameters of the absorption spectra of CO_2 in the 1.6 μm wavelength band. IVOLGA will be able to make these measurements from the upper cloud layer boundary to ~ 140 km of the Venus upper atmosphere. Whole gamut of scientific and technical activities by ISRO and several national and international organizations/agencies have been in full swing to render the Venus mission a grand success. Today, on 28th October, I have finished writing this article sitting in Bengaluru, came here to participate in the National meet on the theme 'ISRO's Venus Orbiter Mission - Science and Enhancing Academia Engagements' to be held during 29-30 October 2025 at ISRO HQ, Bengaluru.

আমাদের প্রাক্তনী ড. মহম্মদ মোশারফ হোসেন এখন যে পদে আছে :

Senior Scientist,
Space Physics Laboratory, Vikram Sarabhai Space Centre,
ISRO PO., Thiruvananthapuram,
Kerala, India, 695022

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং : দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার

পলাশ সিনহা

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৪)

মানব সভ্যতার শুরু থেকেই গণনা ও সংখ্যার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ, সময় মাপা, আকাশ পর্যবেক্ষণ, সবেতেই সংখ্যা এবং মৌলিক গণিত অপরিহার্য। যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ—এই চারটি প্রাথমিক গণিত প্রক্রিয়া হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিন্তু মানুষের জ্ঞান থেমে থাকেনি। ধাপে ধাপে সংখ্যা থেকে বীজগণিত, এরপর যুক্তিবিদ্যা, অ্যালগরিদম, কম্পিউটার ও প্রসেসর—এভাবে আমরা আজকের কৃত্রিম বুদ্ধিমতা (Artificial Intelligence, AI) এবং মেশিন লার্নিং (Machine Learning, ML)-এর যুগে পৌঁছেছি। ভারতে প্রাচীন সভ্যতায় গণনার বিভিন্ন পদ্ধতি চালু থাকলেও আধুনিক সংখ্যাব্যবস্থার মূল ভিত্তি তৈরি হয় এখানেই। ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে প্রথমবারের মতো শূন্যকে সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং শূন্যের সাহায্যে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের নিয়ম নির্ধারণ করা হয়। এর ফলে দশমিক পদ্ধতি, এমনকি কম্পিউটারের বাইনারি সংখ্যা ব্যবস্থাও সম্ভব হয়েছে। নবম শতকে গণিতবিদরা সমীকরণ সমাধান ও হিন্দু-আরবিক সংখ্যার বৈজ্ঞানিক ব্যবহার প্রচলিত করেন। এ থেকেই 'অ্যালগরিদম' শব্দটির উৎপত্তি, যা আজকের কম্পিউটার প্রোগ্রামিংয়ের প্রাণ।

ঊনবিংশ শতকে বুলিয়ান অ্যালজেব্রার উদ্ভাবন হয়। এতে প্রতিটি সিদ্ধান্তকে ১ (সত্য) বা ০ (মিথ্যা) দিয়ে প্রকাশ করা যায়। এই ধারণাই ইলেকট্রনিক সার্কিট এবং লজিক গেট তৈরির মূল ভিত্তি। প্রতিটি কম্পিউটার চিপের ভেতরে কোটি কোটি গণনা এই ১ ও ০-এর লজিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। বিশ শতকের প্রথম দিকে টুরিং গণনার সীমা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিপ্লবী ধারণা দেন। তাঁর 'টুরিং মেশিন'-এর ধারণা আধুনিক প্রোগ্রামেবল কম্পিউটার এবং সফটওয়্যারের তাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কম্পিউটারের ব্যবহার ত্বরান্বিত হয়। ১৯৪৫ সালে প্রস্তাবিত নিউম্যান আর্কিটেকচার CPU বা Central Processing Unit-কে কম্পিউটারের 'মস্তিষ্ক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। CPU একটি দ্রুতগতি সম্পন্ন গণনাকারী, যা ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি। এটি যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের মতো প্রাথমিক অপারেশন সেকেন্ডে কোটি কোটি বার করতে সক্ষম। ১৯৭১ সালে ইন্টেল তৈরি করে Intel 4004, বিশ্বের প্রথম মাইক্রোপ্রসেসর। এরপর থেকে CPU-এর ক্ষমতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

মানব মস্তিষ্ক থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৫৮ সালে প্রথম কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্ক (Perceptron) তৈরি হয়। এটি কম্পিউটারের ইনপুট ডেটা শ্রেণিবিন্যাস করতে সক্ষম। প্রকৃত অগ্রগতি আসে ১৯৮৬ সালে, যখন Backpropagation Algorithm জনপ্রিয় হয়। এর মাধ্যমে নিউরাল নেটওয়ার্ক নিজের ত্রুটি সংশোধন করে আরও ভালোভাবে শিখতে পারে। ১৯৯০-এর দশক থেকে CPU এবং GPU দ্রুত শক্তিশালী হতে থাকে। ইন্টারনেট এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ফলে বিপুল পরিমাণ ডেটা সহজলভ্য হয়। এই দুটি মিলিত হয়ে মেশিন লার্নিং এবং নিউরাল নেটওয়ার্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যায়। ২০১২ সালে তৈরি হয় ডীপ নিউরাল নেটওয়ার্ক

AlexNet, যা ইমেজনেট প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে এবং ডীপ লার্নিং বিপ্লবের সূচনা করে। এখান থেকেই চ্যাটবট, স্বয়ংচালিত গাড়ি, ভাষান্তর ব্যবস্থা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে AIএর মতো প্রযুক্তির বিকাশ শুরু হয়।

সংক্ষেপে বলা যায়—প্রথমে ছিল সংখ্যা, তারপর শূন্য। এরপর এলো অ্যালগরিদম ও লজিক। প্রসেসর ও কম্পিউটার দিল গতি ও শক্তি। আজকের দিনে ডেটা, প্রসেসর ও অ্যালগরিদম মিলেই জন্ম দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং। AI হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা যন্ত্রকে মানুষের মতো চিন্তা করার ক্ষমতা দেয়। এটি তথ্য বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নিতে, সমস্যা সমাধান করতে এবং শেখার ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। মেশিন লার্নিং হলো AI-এর একটি উপশাখা, যেখানে যন্ত্র নিজে নিজে শেখে এবং অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে ভবিষ্যতে আরও ভালো সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

AI এবং মেশিন লার্নিং আজকের দিনে আমাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কৃষিক্ষেত্রে, বিশেষত আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা, মাটির উর্বরতার ক্ষয় এবং বাজার মূল্যের ওঠানামার কারণে কৃষকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ থাকে। AI-ভিত্তিক সিস্টেম এখন মাটির আর্দ্রতা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, সেচ এবং সার ব্যবস্থাপনা নির্ধারণে সাহায্য করছে। ড্রোন এবং সেন্সারের মাধ্যমে ফসলের রোগ শনাক্তকরণ এবং কীটনাশক ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ছে, খরচ কমছে এবং ক্ষতির ঝুঁকি কমছে।

মাছ চাষেও AI ও মেশিন লার্নিং বিপ্লব ঘটাচ্ছে। অতিরিক্ত মাছ ধরা, জল দূষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকি বেড়েছে। AI-ভিত্তিক ফিড ম্যানেজমেন্ট, জলের মান পর্যবেক্ষণ এবং উপগ্রহচিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে মাছ চাষে নতুন সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। ফলে খরচ কমছে, লাভ বাড়ছে এবং সমুদ্রের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে কাজ না করেও উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও AI শিক্ষার মান এবং সমান সুযোগ নিশ্চিত করছে। বড় শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষক সংকট, ছাত্রছাত্রীর ভিড় এবং অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা চ্যালেঞ্জ। AI-ভিত্তিক শিক্ষামাধ্যম ছাত্রদের দুর্বল দিক চিহ্নিত করে ব্যক্তিগত শিক্ষা প্রদান করছে। খাতা মূল্যায়ন, অনলাইন পরীক্ষায় প্রোক্টরিং এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর জন্য ভয়েস-টু-টেক্সট টুল— সবকিছুতে AI শিক্ষকের কাজ সহজ করছে এবং শিক্ষার মান বাড়াচ্ছে।

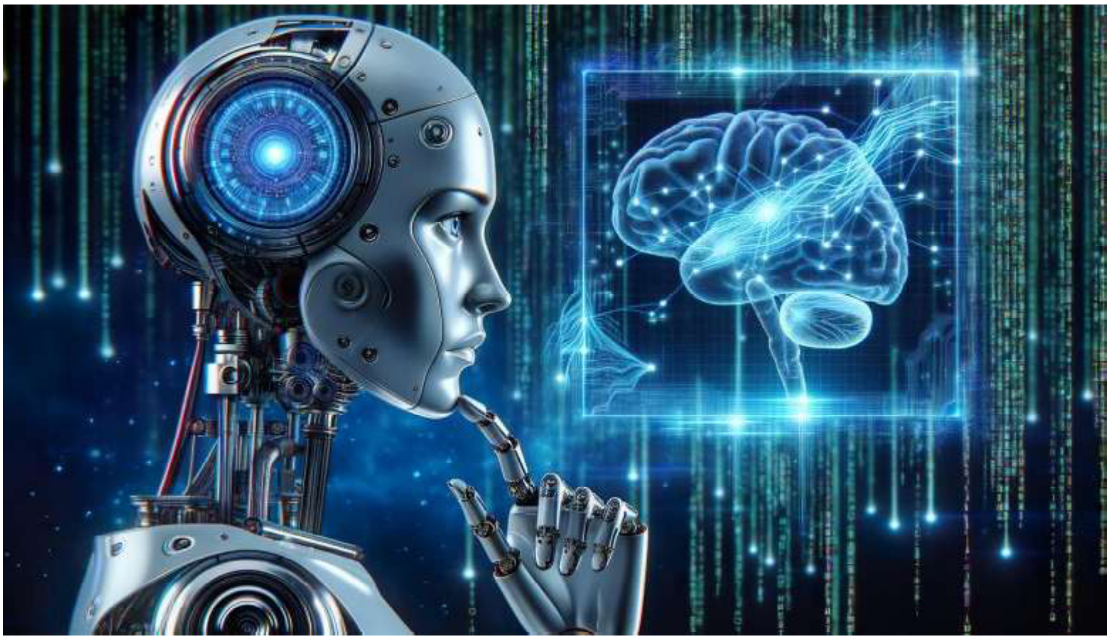

স্বাস্থ্যসেবায়ও AI বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। দূরবর্তী গ্রামীণ অঞ্চলেও AI-চালিত অ্যাপ ও চ্যাটবট রোগ নির্ণয়, প্রাথমিক চিকিৎসা, ওষুধ এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করছে। AI বিশাল পরিমাণ ডেটা বিশ্লেষণ করে রোগ শনাক্তকরণ এবং নতুন ওষুধ আবিষ্কারে সহায়ক হচ্ছে। ওয়্যারেবল ডিভাইসের (যেমন Smart Watch) মাধ্যমে হার্টবিট, ঘুম এবং শারীরিক তথ্য বিশ্লেষণ করে স্বাস্থ্য পরামর্শ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে। AI/ML দ্রুত ও নির্ভুল রোগ নির্ণয় এবং দূরবর্তী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করছে।

ব্যবসা ও ভ্রমণেও AI ব্যবহার হচ্ছে। AI-ভিত্তিক Recommendation, Robo-Advisor, চ্যাটবট এবং মার্কেট বিশ্লেষণ ব্যবসাকে দ্রুত ও দক্ষ করছে। ভ্রমণ এবং পর্যটনে AI-ভিত্তিক ট্রাভেল অ্যাপ, বুকিং, Video/Audio গাইড এবং ভিড় নিয়ন্ত্রণকে সহজ, নিরাপদ ও স্মার্ট করেছে। এইভাবে দেখা যায়, AI এবং মেশিন লার্নিং কেবল প্রযুক্তির সীমা বাড়ায়নি, মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে আরও সহজ, নিরাপদ এবং উৎপাদনশীল করেছে। কৃষি, মাছ চাষ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ব্যবসা এবং পর্যটন—প্রায় সব ক্ষেত্রে AI/ML-এর ব্যবহার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

তবে AI ও মেশিন লার্নিং ব্যবহারে কিছু সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গ্রামীণ ভারতের অনেক এলাকায় এখনও ইন্টারনেট দুর্বল, বিদ্যুৎ নেই, এবং স্মার্টফোন বা সেন্সরের খরচ অনেক কৃষকের নাগালের বাইরে। অনেক কৃষক বা মৎস্যজীবী প্রযুক্তি ব্যবহার করতে অভ্যস্ত নন, ফলে তাদের জন্য AI-ভিত্তিক পূর্বাভাস ভুল হতে পারে, যা ক্ষতির ঝুঁকি বাড়ায়। শিক্ষাক্ষেত্রেও গ্রামীণ অঞ্চলে ইন্টারনেটের অভাব এবং স্মার্টফোন বা ল্যাপটপের সীমিত সংখ্যাতে বৈষম্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। AI যতই বুদ্ধিমান হোক, এটি মানুষের আবেগ এবং শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্কের মানবিক দিক বুঝতে পারে না। ছাত্রছাত্রীরা যদি শুধুমাত্র প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তাদের নিজস্ব চিন্তাশক্তি ক্ষীণ হতে পারে। এছাড়া অনেক প্ল্যাটফর্ম ছাত্র বা রোগীর ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করে, যা গোপনীয়তার সমস্যা তৈরি করতে পারে। স্বাস্থ্যসেবায়ও AI সব সময় ১০০ শতাংশ নির্ভুল নয়; ভুল রোগ নির্ণয়ের ঝুঁকি থাকে এবং প্রযুক্তির অতিরিক্ত ব্যবহার চিকিৎসকদের মানবিক দিক কমিয়ে দিতে পারে। গ্রামীণ এলাকায় অনেক ডাক্তার ও সেবিকাই এখনও এই প্রযুক্তি ব্যবহার শেখেননি, তাই সবাই সমানভাবে উপকৃত হতে পারছে না।

ভবিষ্যতে AI ও মেশিন লার্নিং দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী ও সমান সুযোগপূর্ণ করতে পারে। কৃষিক্ষেত্রে সহজলভ্য প্রযুক্তি কম খরচে বেশি ফসল উৎপাদন, জল ও মাটির সঠিক ব্যবহার এবং অর্থিকভাবে শক্তিশালী কৃষক সমাজ গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। মৎস্য খাতেও ডেটাভিত্তিক পূর্বাভাস, বাজার সংযোগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হবে। শিক্ষাক্ষেত্রে AI শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিগতকৃত এবং সমান সুযোগপূর্ণ করে তুলবে, তবে প্রযুক্তি কখনো শিক্ষকের বিকল্প হতে পারে না। সহায়ক হিসেবে এবং প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করলে শিক্ষার মান ও প্রসার—উভয়ই উন্নতি পাবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে AI দূরবর্তী অঞ্চলে সেবা পৌঁছে দিতে সাহায্য করবে, তবে যথাযথ অবকাঠামো, ইন্টারনেট এবং প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে AI/ML দেশের কৃষি, মাছ চাষ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা ও ভ্রমণসহ নানা ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন এবং মানুষের জীবনমান উন্নত করতে সক্ষম।

স্মৃতিগাঁথা

বিষ্ণুচরণ পাল

(প্রবেশবর্ষ : ২০০৪)

সময়ের ধূসর পাতা
নিভে যাওয়া রবি,
লেগে থাকা কালো ছোপ
জীবনের জলছবি।
বারে বারে শুধু তাই
ফিরে যায় মন,
যতই যা বলি না
শোনে না বারণ।
অচেনা মুখের সারি
অদ্ভুত শাসন,
ভালো কিছু না লাগার
প্রথম সমীকরণ।
আপন থেকে দূরে
একা একা থাকা,
রুম নাম্বার তেরো
আরও তিনটে বোকা।
খুলে যায় জট
একে একে সব,
'সত্যানন্দের জয়'
মুখে মুখে রব।

কলেজ, হোস্টেল আর
বিকেলের খেলা,
চায়ের দোকানে বসে
সন্ধেরই মেলা।
খাবার ঘণ্টা যেন
একরাশি হাসি,
ডাইনিং হল সে তো
সর্ব রোগনাশী।
দাদা, ভাই, ব্যাচমেট
যেন এক ঘর,
যে বাঁধনে বাধা আছে
সে করবে পর!
পড়াশোনা, খেলাধূলা
আরও কত কিছু,
এতকাল পরেও তা
ছাড়ে নাকো পিছু।
এভাবেই কেটেছিল
দিনগুলি সোনার,
যতদিন আছে প্রাণ
নয়কো তা ভোলার।

('আনন্দদীপ', ২০২৪ সংখ্যায় ভুলক্রমে অর্ধেক ছাপা হওয়া এই কবিতাটি এই সংখ্যায় পুনরায় দেওয়া হল। এই ত্রুটির জন্য পত্রিকা সম্পাদকমণ্ডলী ক্ষমাপ্রার্থী)

পথশিশু

সুব্রত চৌধুরী

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৩)

ঠাণ্ডা লাগছে যতেক বাচ্চাগুলোর গায়ে,
কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে শিশু ও মায়ে।
রসনা তৃপ্তির সন্ধানে বাবা হয়েছে বাহির,
সকলের খাবার মা ফোটাবে কোনমতে তারপর।
ত্যাগ করতে বাধ্য হবে কেউ আপন খাবার;
নদীতীরে অথবা বাস স্ট্যান্ডে পলিথিন নির্মিত ঘর।
নকল আনন্দ নিয়ে বাচ্চাগুলো করে হুড়োহুড়ি,
দরদী কোনো ব্যক্তি হাতে গুঁজে দেয় কানাকড়ি।
তোমাদের জন্য নেই কারো মানবিক ভাবনার বিস্তার
মায়ের পেট থেকে; আজন্ম বৈষম্যের শিকার
রেখেছো মনের মাঝে; অনন্ত ক্ষোভের আধার
জাগতিক চাহিদা মেটাতে, বেছে নাও লড়াইয়ের প্রান্তর।
নানান প্রশ্ন জেগে ওঠে মনের ভেতর
ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুঁজে পায় না কোন উত্তর।
প্রতি শিশুর আছে আপন বাঁচার অধিকার।
নামহীন গোত্রহীন উদিত হবে কোন বিস্ময় বালক
মন মাঝে মোর জেগে ওঠে এই আশার আলোক।

(কবিতাটির একটি বিশেষত্ব আছে, প্রতি লাইনের প্রথম অক্ষর দিয়ে তৈরি হয় একটি বাক্য : ঠাকুর সত্যানন্দ তোমারে জানাই প্রণাম।)

তুমি আছো

সাগর কুমার দাস

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৮৪)

তুমি আছো, সকলে জানে,
সবার উপরে বিশ্বটা মানে।
ফুলে ফলে বসুন্ধরা সাজানো,
ছয় ঋতুর আবহাওয়ার মধুর পরিবর্তনে,
বিস্ময়কর সৃষ্টিকারী প্রমাণ্য—
তুমি আছো সকলে জানে।

ঘরে ঘরে ধূপ-ঘণ্টা, বাদ্য কাঁসরের আড়ম্বরে,
বারোটি মাসে তেরোটি পার্বণে
নতুন বর্ষের সামগ্রিক সূচনাটা
বৈশাখের প্রখর দাব-দাহের দহনে,
তুমি আছো সকলে জানে।

মেসুমির গর্জনে বৃষ্টিভাব বার্তা
শরতের কাশফুলের অপূর্ব শোভা রূপ
মহালয়ার গ্রামাফোন রেকর্ডের সংস্কৃত শ্লোক—
বাঙালির শ্রেষ্ঠ পূজার মনারম আহ্বানে,
তুমি আছে সকলে জানে।

বসন্তের হোলির ধূম আনন্দ ব্যস্ততা
আজও খেদায় প্রতিটি হৃদয় মাঝারে,
বৃন্দাবনে গোপযোগী সুধামাখা লীলা
সনাতন ধর্মের চিরন্তন কাহিনি স্মরণে।
তুমি আছো সকলে জানে।

আঘাট হইতে ঘাট আপথ হইবে পথ,
কলিযুগ একবর্ণ হইব যবন।
জন্মিলে মরিতে হবে—সত্য
বিজ্ঞানীরা স্বার্থতার—মহাশূন্যে
তুমি আছো সকলে জানে।

সেই দুর্গাপুকুরের চারপাশ

মোহাম্মদ সাদউদ্দিন

(প্রবেশবর্ষ ১৯৮৬)

শুশুনির শাক ভরা সেই
দুর্গাপুকুরের পাঁক মেখে পড়ে থাকতে
বারবার ইচ্ছা জাগে
বাঁশবাগানের ঝিরঝিরে হাওয়া
তেঁতুল গাছের কাঠ পিঁপড়ের কামড়
ঝিকিমিকি বেলায় বলাকার ঠোঁটে
মাছ ধরার সেই দৃশ্য
আজো মনকে পাগল করে দেয়
আবার মৃত্যুর পর
কুড়ুজালি দিয়ে মাছ ধরতে ফিরে আসব?
ছাতু মৌলভির সেই কুলগাছে চড়ে
কুল পেড়ে খাব?
আবার কি ফিরে পাব
যুবতী ভাদরের সেই সাঁতার কাটার দিন?
ভালোবাসার পাগল মন
শুধু বলে উঠে, বাংলা তো আমার
সেই দুর্গাপুকুরের চারপাশ।

ছাত্রাবাসে

সিদ্ধার্থ ঘোষ

(প্রবেশবর্ষ ১৯৮৯)

অভেদানন্দ কলেজ আমার,
নিবাস সত্যানন্দ ছাত্রাবাস।
সময়টা উনিশশো ঊননব্বই
থেকে বিরানব্বই।
গণিতের সাম্মানিক,
সাথে ফুটবল অভ্যাস।
কখন ঘুমাই কখন উঠি
ছিলনা কোনো মাপকাঠি
জীবনটা ছিল মার্ভেলাস।
এ ঘর ও ঘর ইচ্ছেমতো
ছিল না কোনো বাধা নিষেধ
শুধুই উল্লাস—
সকাল থেকে রাত পর্যন্ত।
মনে পড়ে সব আজ
বিড়িতে সবাই ফেমাস
জমজমাট আড্ডা চলত।
এক্সামের তিন মাস সব রুম সিরিয়াস
শুধু ব্যাট হাতে নিউটন সারাদিন ব্যস্ত।
লাইব্রেরীর বারান্দা
কখনো গরম, কখনো ঠাণ্ডা।
অনুপম, জয়ন্ত, চন্দন, অমিত্র
বারমুডা আর গেঞ্জি পরে ঘুরত।
সকলের প্রিয় চঞ্চলদা ‘কখনো কফি হাউস’,
কখনো ‘সে আমার ছোট বোন’
হুবহু মান্না কণ্ঠে গাইত।

বাপিদার থালার বোল
তালে তাল দিয়ে ক্ষ্যাপা সুব্রতর
‘‘ক্যানবা পীড়িত কইরা ছিলাম রে’’
আসর জমিয়ে তুলত।

রফি, সাবির কুমার গেয়ে ব্যর্থ
সঙ্গীতে নেই তার কোনো দাম,
নাম তার মহিবুল ইসলাম।
নোটনেশ, হাফ ব্যাক
ড্রিবলিং ও ছোট্ট পাস
মাঝমাঠে সিদ্ধার্থ—একাই একশো।
'গোল গোল' চিৎকার
মনোরম দৃশ্য আহা! কী চমৎকার!
সবাইকে নিয়ে পলাশদা নাচত।
ইমাদুর রহমান মালদায় বাড়ি তার
গোল খেয়ে কি জানি কী বিড়বিড় করত।
সামাদ রেজাউল বহু কষ্টে
তাকে থামাতো।
মানব যশ সকলের অভিভাবক
জীবন করেছে উৎসর্গ।
কলেজের যত চাপ ইউনিয়নের সব কাজ
সারা গায়ে মেখে রুমে ফিরে ক্লান্ত।
তাপসদা, বুদ্ধদেব সব চেয়ে সুখী আজ
শুনেছি দু'জনেই সিনিয়র প্রফেসর
প্রদীপ আমেরিকায় কর্মে নিযুক্ত।
সকলের ধনাদা, চির ঘুমের দেশে
মরণ পারবেনা তাকে আমাদের
থেকে কেড়ে নিতে।
রাতের ছাত্রাবাস
হঠাৎ হঠাৎ কেঁপে উঠত।
ঘোষাল ঠাকুরের রান্না
চোখ বেয়ে ঝরাত শুধু কান্না।

বিশুদা ভালো ছিল,
মন দিয়ে মাছের ঝোল
আর আলু পোস্ত বানাত।
গ্র্যান্ডের দিন গুলো
গৌরীসেনের বৌভাতকে হার মানাত।
রবিনদা কড়া প্রিফেক্ট
রাত বারোটার পর অডিট বসাত।
হিসাবে গরমিল-কঠোর অনুশাসন
চাবুক দিয়ে সে পেটাত।
নিয়মের নিরিখে,
একেকজন একেকদিকে।
জীবনযুদ্ধ করেছি সবাই রপ্ত।
"আবার হবে তো দেখা",
দাদা দিদি বন্ধু বান্ধব, ভাই বোন,
সবাই ভাল থাকো, সুস্থ থাকো;
আমাদের কথা, এক লেখায়
হবে না সমাপ্ত।

হাতে গড়া প্রাচীর

সুজিত কুমার দাস

(প্রবেশবর্ষ ১৯৯২)

বর্ণচোরেরা
রঙ চুরি করে
রাতদিন!
তারপর—
থরে থরে
রাখে সাজিয়ে।
আর
বাকি বেশিরভাগেরাই
ধূসর জগতের
বাসিন্দা হয়ে
দিন কাটায়
আঁধারের কুঘ্রাণ নিয়ে।
অথচ ওরাও
রাঙামাটির, সবুজ দ্বীপের
অধিবাসী ছিল একদিন!

দিনে দিনে ভুলে গেছে তা।
ভুলে গেছে
ফুলের গন্ধ, রং, পেলবতা।
অথচ
ওরাও সুপক্ক আমের সরস জগতের
অধিবাসী ছিল!
তপ্ত বালির আঁচ
পেতে পেতে
সে সরসতা
গেছে ক্ষয়ে!

অথচ
হাতে তাদের
এখনও সে ঝাণ্ডা—
মুখে
বিপ্লবধ্বনি।
ক্ষয়িত হৃদয়ে আশা
একই সারিতে
বসার পংক্তি
রচনা তারা করবেই।

আশা নিয়েই
দিন কাটে!
কাটে বছর, যুগ।
কাটেনা কিন্তু
দুর্দিন-দুর্ভাগাদের।
বর্ণচোরের দল, দঙ্গল বেধে
স্বপ্ন চুরি করে।

আলো যেন
সরল পথে
সোজা চলে যায়—
আলোর দিকেই।
আর
পাদপ্রদীপের দেশে
জমাট অন্ধকার
স্তূপীকৃত হয়!

বন্ধন

বুবুল সরকার

(প্রবেশবর্ষ ১৯৯৫)

১

কেমন যেন একটা অদ্ভুত নীরবতা।
বদ্ধ ঘরে সবাই যেন বন্দি।।
সারাদিনের ব্যস্ততা।
চাওয়া পাওয়ার ফন্দি।।
আর তো কয়েকটা বছর।
লক্ষ্য হবে তো সাবাড়?
কিসের লক্ষ্য? কিসের নজর?
বেঁচে থাকাটাই আসল সবার।।
ছাত্রাবাসের বন্ধনেতে এসো সবাই
বাকি পথটুকু সাথে চলতে যে চাই...

২

পিতার কর্ত্যবে তুমি অবিচল
পুত্র রুপেও আসমুদ্র হিমাচল।।
প্রেয়সির কাজল ভরা আঁখি
সেখানেও নেই কোনো ফাঁকি।
কর্মক্ষেত্রে তুমি দশাবতার
মেটাও শুধু 'বসের' আবদার।।
প্রতিবেশীও তুমি অনবদ্য
সুখে-দুঃখে-বিপদে দায়বদ্ধ।।
আমিও তো চাই কিছু
সম্পর্ক অল্প হলেও আছে কিছু।।
হয়তো তেমন কিছু পারিনি দিতে
আছে তবু স্নেহ-মায়ার অদৃশ্য ফিতে
ডিসেম্বরের ঐ একটা দিন
আমার প্রাপ্য, তোদের ঋণ।।
আয় না তোরা সবাইমিলে
হাসি আমি খিলখিলিয়ে।।
ছোট্ট শুধু এই আবদার
দে ফিরিয়ে তোরা বারবার।।

সুখের পায়রা

স্বপন বাগদী

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৭)

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ শরৎ-এর প্রারম্ভিক কাল,
কাশফুল, মাথার উপর উজ্জ্বল নির্মল আকাশ।
সেই আকাশের বুক চিরে—
অপরাহ্নের শেষ প্রান্তে উড়ে এসেছিল,
সুখের পায়রা, শূন্য খাঁচায়।
মুখে বক্ বক্ বকম্ শব্দ। তাকে পারিনি—
খাঁচায় বন্দি করতে। ফিরায়ে দিই—
নিজ গৃহে—

আবার হাজির হয়,
শূন্য খাঁচায়। তার চোখে মলিনতা, দৃষ্টিগোচর হয়।
মুখে বক্ বক্ বকম শব্দ।
ফিরাতে পারিনি সেদিন—
পূর্ণ করি শূন্য খাঁচা।
প্রথম আলিঙ্গনেই সমস্ত শরীরে আলোড়ন
সৃষ্টি করল। যার মুখ চুম্বনে ধন্য হত অন্তর।
যার দিকে চোখ ফিরাতেই—
মনের বৃত্তিগুলো নিস্তেজ হলো;
সে সুখের পায়রা।
তার ডানাগুলো ছাঁটিনি। সে বিশ্বাসী হয়ে উঠল,
মুখে বলতো বক্-বক্-বকম্। সে থাকতো
মনের মণিকোঠায়, সারা হৃদয় জুড়ে।
একদিন সমস্ত বিশ্বাস চূর্ণ করে
পশ্চিম আকাশে উড়ে গেল,
সে—সুখের পায়রা।

জেগে আছে চাঁদ

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৬)

জেগে আছে পূর্ণিমার চাঁদ
আর জেগে আমি।
আমার প্রিয়া গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন,
সে তো চন্দ্রমুখী, আমার জীবনের চাঁদ।

আর ওই যে আকাশের চাঁদের দাগগুলো
আমার জীবনের ব্যর্থতার চিকচিহ্ন।
চাঁদের পাশে উজ্জ্বল একটি তারা
প্রিয়ার পাশে আমার প্রাণাধিক আত্মজা।
খোলা বাতায়ন স্নিগ্ধ রজনী
সারা অঙ্গে শরতের হিমেল হাওয়ার শিহরণ।
জেগে আছে চাঁদ
আর জেগে আছি আমি।

কী অপরূপ ওই রজনীকর
অপূর্ব প্রশান্তি আমার প্রিয়ার আননে
মৃদু কোমল সমীকরণ জ্যোৎস্নাস্নাত বৃক্ষরাজি
শরতের বাতাস পাতার কানে ফিস্‌ফাস্‌
যেন ঘুমন্ত প্রিয়ার হৃদস্পন্দন।
জেগে আছে চাঁদ
আর জেগে আছি আমি।

সহসা একটুকরো কালো মেঘের আড়ালে চাঁদ
আমার ঘরে ঘনায় তিমির।
চমকে উঠে হাতড়াই বিছানা
হতচকিত হয়ে জেগে ওঠে চন্দ্রমুখী।
কী আশ্চর্য। চন্দ্রমুখী জাগ্রত।
আর মুখ লুকিয়ে আছে আকাশের চাঁদ!

প্রিয়তমা অবাক হয়ে শুধায়
কেন জেগে আছো?
আমি স্মিত হেসে শরীর এলাই বিছানায়
সে আবার ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন
আমি স্বগতোক্তি করি
এক আকাশে দুটো চাঁদ কখনো জাগে?
কখনোই নয়, কোনো দিনও নয়।
তাই তো প্রিয়তমা চন্দ্রমুখী ঘুমন্ত
আর মেঘ সরিয়ে জেগে আছে পূর্ণিমার চাঁদ
আর জেগে আছি আমি।

প্রিয়তমা

কেরামত আলি

(প্রবেশবর্ষ : ১৯৯৬, এইচ. এস)

তুমি সুদক্ষ স্রষ্টার এক সৃষ্টি
রক্ত মাংসের এক প্রাণবন্ত প্রতিমা
তুমি রূপে এক অনন্ত আধার
তাই তোমার নেই কোনো উপমা।

তোমার দু-চোখ সে তো গভীর পারাবার
যার স্পর্শে জ্বলছে আমার হৃদয়দ্বীপ
তোমার মিষ্ট ওষ্ঠের মধুর স্পর্শে
ফুটেছে তারা আমার হৃদয় মহাকাশে।

তাই জীব মাঝে মাঝে তুমি কে?
রূপ ঐশ্বর্যে ভরা কোন তিলোত্তমা?
না, স্বর্গের কোনো মায়া অপ্সরা?
বলবে না? বয়েই গেল ভারি—
তুমি যে আমার প্রিয়তমা হৃদয়েশ্বরী।

ভুল তো ভাঙতে চায় না

সন্দীপ গোলদার

(প্রবেশবর্ষ : ২০০২)

চোখে জল এসে গেল
দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে
ডুবে ছিলাম হাসি কান্নার গভীরে
হঠাৎ ভুল ভেঙে গেল।

কোনো এক কবির কল্পনা নিয়ে
অভিনয় চলছে
আর তাই দেখে আমি কাঁদতে বসেছি।

মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এলাম
কোলাহল মুখর রাস্তা পেরিয়ে
ফিরে এলাম বাসায়
কঠিন বাস্তবে।

আবার মনে কেন প্রশ্ন জাগছে
যাকে বাস্তব বলছি
সত্যিই কি সেটা বাস্তব?
দুনিয়া কি রঙ্গমঞ্চ নয়?
জীবন কি নাটক নয়?

তাই যদি হয়
পাওয়ার আনন্দে কেন আত্মহারা হই?
হারালে হাহাকার আর কান্নায় কেন বুক ভাসায়?
এখানে যা পাবার তাই পায়
যা হারাবার তা হারাতেও হয়
শ্রাবণে দর্শনে অনুভবে
সব বুঝতেও পারি
তবুও ভুল তো ভাঙতে চায় না।

ডাক দেয় পুনর্মিলন

বিষ্ণুচরণ পাল

(প্রবেশবর্ষ : ২০০৪)

কল্পনার জগতে পৃথিবীর বাস্তবতা
থাবা বসাতে থাকে নিয়ত,
দুহাতে আগলে রাখার সমীকরণ
ভুল হতে থাকে হিসেবের গরমিলে।
এক পৃথিবী কর্মকাণ্ডের দল
উঁকি মেরে বলতে থাকে—
'মিছিলে ছুটে চল'।
সকালের ঘুম ভাঙা রাতের বিছানাতে
রেখে যায় নির্মম ক্লান্তি, অসাড়তা।
জীবন এক-পা, দু-পা চলতে চলতে
বুড়ো হতে থাকে অস্তিত্ব,
কুঁচকে যেতে থাকা মুখের ভাঁজ দেখে
চুলের পাক বিদ্রুপ করে খালি।
হারিয়ে যেতে থাকে
পিছন ফিরে তাকানোর অবসর, অজুহাত।
ফুরিয়ে যেতে যেতেই তখন
কানের পাশে ধ্বনিত হয়
নিদারুণ সুখ-স্মৃতির আগাম সংবাদ।
মুহূর্তের জ্বলে ওঠা স্ফুলিঙ্গের মতো
আনন্দধারা বর্ষণের সেই কল্প-ভাবনায়।
খুঁজে পাই তাগিদ।
সঞ্জীবনী সুধায় স্নাত হওয়ার
একটাই প্রাচীন ঠিকানা।
যেখান ভেদাভেদ খুলে,
জীবন-মাঠের দৌড়ঝাঁপ ভুলে,
তুলে রাখা থাকে রসদ—
নিজেকে একদিন ফিরে পাওয়ার।

Friendship..

Hafizul Kabir

(Entry Year 2004)

O'my dear friend
Now I travel by your train.
Never seem yourself lone
I am always in your mirth and mourn.

When I hear any cuckoo bird to sing
I begin to float on your dream.
If you notice any fault in my behaviour
As a friend you will make me aware.

Most person give their dearest ones an artificial things
But I want to gift you, a natural living thing-
A refresh rose-plant, on its head
Has a blooming rose mingling of yellow and red.

If I droop of passion on your part,
Support me, if it be able
Or console me if it be impossible,
But don't break my heart.

Public wants to know about our friendship's source
I say them, it starts in the degree course.
Our friendship is not only for three years
But also it is forever's...

May be you can refuse this relationship
But never I can forget our friendship.
Oh my dear friend oh my dear friend
Never delete me from your brain...

ভৌতিক পুকুরপাড়

রামকৃষ্ণ পাল
(প্রবেশবর্ষ ২০০০)

আমরা সাতজন শিক্ষক বোলপুর থেকে নিয়মিত বিদ্যালয় যাতায়াত করার জন্য একটি গাড়ি ভাড়া নিয়েছি। আমাদের যথাসময়ে বিদ্যালেয় পৌঁছে দেওয়া ও ছুটি হলে আবার ফেরত নিয়ে আসা ওর কাজ। আর এই বিষয়টি অত্যন্ত সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে করে চলেছেন ড্রাইভার পরেশ দাস; আমাদের প্রিয় পরেশদা। সামনের সিটে অর্থাৎ ড্রাইভারের পাশে বসে সহকর্মী রঞ্জনদা। একদিন রঞ্জনদা না আসায় আমি ওর জায়গায় বসলাম। পরেশদা গাড়ি চালাচ্ছে। হঠাৎ বললাম, ''পরেশদা, আমাদের বিদ্যালয়ে প্রতি দু'বছর অন্তর ম্যাগাজিন বেরোয়। এবছর বেরোবে। আমি দায়িত্বে আছি। তোমার কোনো ঘটনা আছে যেটা সবাইকে বলার মতো?''

—আছে তো। তবে একদম ভুতুড়ে। চলবে?

—চলবে কিনা আগে তো শুনি। বলো।

পরেশদা বলতে শুরু করল। চুপচাপ শুনলাম সেই সন্ধ্যের হাড়-হিম-করা অভিজ্ঞতার কথা। সেটাই আজ তোমাদের শোনাব পরেশদার কলমে। সত্য-মিথ্যা যাচাই করা হয়নি। সে ভার ছেড়ে দিলাম পাঠকের ওপর।

সন্ধ্যে ৬টা। প্রান্তিক স্টেশনে সন্তোষদার দোকানে বসে চা খাচ্ছি। গল্পগুজব চলছে। হঠাৎ মোবাইলটি বেজে উঠল। ফোনটা ধরতেই অপরপ্রান্তে পুরুষের গলা, ''হ্যালো। আমি আমডোহরা গ্রাম থেকে বলছি। এখানে একটি মেয়ের প্রসব বেদনা উঠেছে। হাসপাতাল নিয়ে যেতে হবে। আপনি কি গাড়িটি নিয়ে আসতে পারবেন?''

বসেই তো আছি। এই মুহূর্তে কোনো ভাড়াও নেই। পরের ট্রেন আসতে দেরি আছে। মনে মনে ভেবে নিয়ে তাই বললাম, ''হ্যাঁ পারব। আমডোহরা তো? কুড়ি মিনিটের মধ্যে আসছি। আপনারা ততক্ষণ সবকিছু গুছিয়ে রাখুন।'' এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। বর্ষাকাল। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যের অন্ধকারটা একটু বাড়তেই হেডলাইটটা জ্বেলে দিলাম। আমরা দুজন গল্প করতে করতে চলেছি আমডোহরা গ্রামের দিকে। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম।

গ্রামে ঢুকতেই চোখে পড়ল একটি বড় মুদির দোকান। দোকানের পাশে একটি টেলিফোন বুথ। আমরা দাঁড়ালাম। সেখানে জিজ্ঞাসা করতেই পাশ থেকে একটি লুঙ্গিপরা লোক বেরিয়ে এসে বললেন, ''আপনারা এসে গেছেন? বেশ বেশ। আমিই ফোনটা করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের যেতে হবে ঢোলটিকুরী। এই গ্রামটির পরের গ্রাম। ওখানে কোনো টেলিফোন বুথ নেই তো। তাই ফোন করতে এখানে আসতে হল। চলুন চলুন। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'' লোকটি পিছনের সিটে উঠে বসলেন। গাড়ি চলল ঢোলটিকুরীর দিকে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে আমরা ঢোলটিকুরী পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি, একটি মেয়ে প্রসব বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করছে। নাহ! আর দেরি করা ঠিক হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে তুলে নিলাম গাড়িতে। মেয়েটির মা, বাবা, কাকিমা ও দুজন আত্মীয় মেয়েটির সাথে গাড়িতে চেপে বসলেন। গাড়ি ভর্তি হয়ে গেল। এবার তাড়াতাড়ি ছুটে চললাম বোলপুরের উদ্দেশ্যে।

আগেই বলেছি টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে। রাস্তা পিচ্ছিল। তাই স্পিডে গাড়ি চালাতে পারছি না। গ্রামটির শেষে একটা বড় বাঁক। পাশেই পুকুর। সাবধানে বাঁকটি পেরোতেই হঠাৎ গাড়ির স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। এর আবার কী হল রে? চাবি ঘোরালাম। স্টার্ট নিচ্ছে না। আস্তে আস্তে গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। আরেকবার চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আরেকবার। আরও

একবার। আবার একবার। নাহ! কিছুতেই ইঞ্জিন চালু হচ্ছে না। কী করি এবার! কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আরও বেশ কয়েকবার স্টার্ট দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। মহা মুস্কিলে পড়া গেল তো! কী করব ভাবছি, এমন সময় গাড়ির হেডলাইটটাও বন্ধ হয়ে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। হেডলাইটটার আবার কী হল? এতক্ষণ তো ঠিকই জ্বলছিল। ব্রেকে পা ও স্টিয়ারিং-এ হাত দিয়ে বসে ভাবছি কী করব। সবাইকে অবাক করে দিয়ে গাড়িটি এবার নিজে থেকেই পিছতে শুরু করল। আরে গেল, গেল, গেল !! কী হচ্ছে এসব? জোরে পা দিলাম ব্রেকে। কিন্তু একি!! ব্রেক যে ধরছে না! এদিকে গাড়ি আপন গতিতে ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে। একে অন্ধকার, তার উপর রাস্তার দুপাশে খাল। ভীষণ ভয় হচ্ছে গাড়িটি না খালে পড়ে যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খালের দিকে না গিয়ে ঠিক রাস্তা বরাবর পিছিয়ে যাচ্ছে। একশো মিটার মতো গিয়ে আপনা আপনি থেমে গেল। আরে থামল কীভাবে? কিছুই তো বুঝতে পারছি না। আচ্ছা বেশ। থেমেই যখন গেছে, তখন একবার স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে দেখি তো! চাবি ঘোরালাম। এই তো স্টার্ট নিল। হেডলাইটও জ্বলে উঠল। তবে এতক্ষণ হচ্ছিল না যে! ইঞ্জিনে জলটল কিছু ঢুকে থাকতে পারে হয়তো। যাক, সেসব পরে ভাবলেও চলবে। মনে সাহস এল। এবার যাওয়া যাক।

গিয়ার ফেলে এগোনোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু হায়! পূর্বের সেই জায়গায় গিয়ে আবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। তার সাথে তাল মিলিয়ে হেডলাইটটিও বন্ধ হল। গাড়ি চলল আবার পিছনের দিকে। ঠিক যেন আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সত্যিই এবার ভয় পেয়ে গেলাম। এরকম তো কোনোদিন হয়নি! তাছাড়া কোনো ব্যাখ্যাই যে মিলছে না! গাড়ি আমার কন্ট্রোলে নেই। আমি শুধু দর্শকমাত্র। ব্রেক, গিয়ার সব অকেজো, কাজ করছে না। মাথাটা এবার ঘুরছে। মনে হল অজ্ঞান হয়ে যাব এবার। গাড়ি কিন্তু আপন গতিতে পিছিয়েই যাচ্ছে। আবার সেই একশো মিটার গিয়ে আগের জায়গায় এসে থেমে গেল। মনে মনে ইষ্টনাম জপতে শুরু করলাম। এযাত্রায় রক্ষা করো প্রভু।

কিন্তু যাব কী করে? দু'-দুবার চেষ্টা তো করলাম। এবার এগোলে তিনবার হবে। ভীষণ ভয় পাচ্ছি। হাত, পা কাঁপছে। বোতল থেকে জল খেলাম একটু। মনকে শক্ত করলাম। যা আছে কপালে। এগোতে তো হবেই। কতক্ষণ আর এখানে এভাবে পড়ে থাকব? এগোতে যাব; এমন সময় লুঙ্গিপরা লোকটা গাড়ি থেকে নামলেন। আমার কাছে এসে কানে ফিসফিস করে বললেন, ''ভূত বিশ্বাস করেন? মন্ত্রটন্ত্র কিছু?''

আমি বললাম 'না'।

'বুঝেছি'। লোকটি বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়লেন। তারপর বললেন, 'ধূপকাঠি আছে?'

—'হ্যাঁ, তা আছে।'

—'দিন আমাকে। সঙ্গে দেশলাইটাও দিন।'

দেশলাই সমেত এক প্যাকেট ধূপকাঠি দিলাম। উনি সব কাঠিগুলি জ্বালালেন। বিড়বিড় করতে করতে গাড়িটির চারপাশ দু'বার ঘুরলেন। একবার পূর্বদিকে প্রণাম করলেন, আর একবার উত্তরদিকে। তারপর সব কাঠিগুলি মাটিতে গুঁজে দিয়ে বললেন, ''চলুন এবার। আর কিছু হবে না। বিপদ কেটে গেছে।'' দুরুদুরু বুকে গাড়ি স্টার্ট দিলাম। এক চান্সেই নিল। হেডলাইটটিও জ্বলে উঠল। আস্তে আস্তে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে। যে জায়গায় এসে বারবার গাড়িটি থেমে যাচ্ছিল অবশেষে সেখানে এসে পৌঁছলাম। বুকে ঢিপঢিপ শব্দ। কী হয় কী হয়! নাহ! আর কিছু হল না। জায়গাটি অতি সন্তর্পনে পেরলাম। ওহ! বাপরে! খুব জোর বেঁচে গেছি। ভাগ্যিস লোকটি ছিল। নাহলে কী যে হত কে জানে? গাড়ির স্পিড একটু বাড়িয়ে দিলাম।

কিছুটা পথ যাওয়ার পর সবাই একটু ধাতস্থ হতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''এরকম কেন হল বলুন তো? আপনারা কিছু জানেন?''

মেয়েটির বাবা বললেন, ''শুনেছি ওখানে তেঁনারা বাস করেন। অনেকেই দেখেছেন। সন্ধ্যে হলেই আর আমরা কেউ এপথে আসি না। বাধ্য হয়েই আজ আসতে হল। তবে আর ভয় নেই। ভাগ্য ভালো যে, আপনাদের ওই লোকটি সঙ্গে ছিলেন। উনি না থাকলে আজ একটা বড় বিপদ হতে পারত।''

—"আমাদের লোক মানে? ওই লুঙ্গিপরা লোকটির কথা বলছেন তো" সভয়ে বললাম আমি।

—"হ্যাঁ। ওই লুঙ্গিপরা লোকটার কথাই বলছি।"

—"ও তো আপনাদের গ্রামের লোক। আমরা তো শুধু এই দুজন এসেছি।" পাশে বসাও বন্ধুটিকে দেখিয়ে বললাম।

—"কি যা তা বলছেন। ও আমাদের গ্রামের লোক হতে যাবে কেন? আমরা গ্রামের সবাই সবাইকে চিনি। এমনকি পাশের গ্রামেরও সকলে আমাদের পরিচিত। লোকটি তো আপনাদের সঙ্গেই এলেন। ভাবলাম আপনাদের কেউ হবে।"

—"না না আমরা চিনি না। উনি আমডোহরা থেকে উঠলেন। ওঁকেই তো আপনারা ফোন করতে বলেছিলেন?"

—"অ্যাঁ! আমরা তো কাউকে ফোন করতে বলিনি!"

—"বলেন কী? তাহলে আমাদের ডাকল কে? আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল, বিপদ থেকে বাঁচালো, কে সে? তবে কি....!!"

আর ভাবতে পারছি না। শুধু মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "কোথায় তিনি"?

মেয়েটির বাবা বললেন, "উনি তো পুকুর পাড়েই নেমে গেলেন। আর চাপেননি। শুধু বলে গেলেন, আর ভয় নেই। উনি আর যে কেন চাপলেন না, তা গোলেমালে তখন মনে ছিল না।"

তিনি যে কে, তা আমাদের আর কারোরই বুঝতে বাকি রইল না। আমি যে নিজের হাতে তাঁকে ধূপকাঠি, দেশলাই দিলাম! তখন তো ঘুনাক্ষরেও টের পাইনি। তেঁনারা যে আছেন, তবে কী সেটাই আমার মতো ভূত-অবিশ্বাসী লোককে জানান দিয়ে গেল? শরীর অবশ হয়ে আসছে। এবার কানের কাছে কারা যেন অট্টহাস্য করতে লাগল আর বলতে লাগল—যাঁবি নাঁকি আঁরেক বার পুকুরপাঁড়ে? যাঁবি নাঁকি? চল্ চল্। এঁবার গেঁলে আঁর ছাঁড়ব নাঁ। আঁমাদের অবিশ্বাস করা ! হিঁ হিঁ হিঁ হিঁ...।

Die Another Day

Sahebul Islam
(Entry Year : 2002)

At Khargram Rural Hospital, James, just a one day old boy kicked the nurse.The nurse smiled and prophesied its parents that their baby would be very naughty as well as very intelligent. Really James was very intelligent. He never stood second in his class. He passed Madhyamik and Higher Secondary with A+ grade in all Subjects. His father wanted him to be a doctor. There were two girls in his class who loved him very much. Rakhi was ordinary but very good natured, intelligent but not so clever. On the other hand, Soha was very beautiful and smart. It is said that adolescence is a period of stress and strain. James planned to elope with his beloved, Soha, leaving his bright future. Rakhi who loved James so much gave him all the money and ornaments which her family had saved for her marriage. At midnight James stealthily entered his father's room and took the key from under his pillow and stole lifetime savings from the safe and eloped with Soha.

Next morning his mother called him to have his favourite sandwich and coffee. She repeatedly called but got no response. Then she entered the room and found a letter which she delivered to her husband. Knowing the fact his mother cried all day and night. His father and all close relatives searched for continuous one month but all in vain. None could trace them. His mother cried and waited at the door all day for her son's return. But her husband returned everyday in despair. Their only son had made them lifeless human beings. The eloped couple took a room for rent of Rs.5000/ month near Barrackpore. They led a lavish life. As a result, soon their money exhausted. James tried to get a job with 12th pass qualification. At last he got a job of an accountant in a private company. One day he invited his boss to his house for dinner. His boss came to his house and appreciated the beauty of his wife. His wife hoped that he would become a doctor but had become just an ordinary accountant. All her dreams had been shattered. His wife advised him to invite his boss repeatedly so that he might get a promotion in the office. But her intention was other which he could not understand. James repeatedly invited his boss. His boss was an immoral man. Soon an immoral relationship formed between his wife and his boss. One day his wife eloped with his boss with the jewels of Rakhi and money.

He could not imagine that his so loved wife had betrayed him. This was the girl for whom he had forsaken his loving family, his bright career and true love of Rakhi too. Now he had nothing to loose. He planned

to make suicide. For that purpose he went to a medical shop and ordered twenty sleeping pills. But the pharmacist did not provide him sleepingpills without medical prescription. He planned to Die Another Day with another plan.

He went to a stationary shop and ordered a rope. He wanted to hang himself. But alas! There was only a table fan in his rented room. In the evening he went to a tree and threw the rope to a twig of the tree. But the weak twig broke and he fell on the ground. Another man was also seen tying a rope to a twig of the same tree. He asked him if he was trying to make suicide like him. The man said, "Fool boy, I am collecting logs for cooking. Your log will help me to cook my food." The man mockingly said three parting words DIE ANOTHER DAY.

James also planned to DIE ANOTHER DAY with another plan. James tied an earthen jar in his legs and jumped into a river. But unfortunately the water of the river was too low to engulf his whole body. He was stuck in the mud and his head was above water. Another man was also seen in the river. He asked him if he was trying to make suicide like him. The man laughed and said, "Fool boy, I am catching fishes for my livelihood." The man rescued him and mockingly said three parting words DIE ANOTHER DAY.

James also planned to DIE ANOTHER DAY with another plan. He went to the same stationary shop and bought Mortein Ratkill. He ate it at night and next day he found himself at Barrackpore hospital. The owner of his house who took him to hospital told him that the poison which he ate last night, had expired. So he did not die. Perhaps the Almighty did not love him so much to take him. James asked all the other patients in the room if they had tried to make suicide like him. All the patients mockingly told him to DIE ANOTHER DAY.

After three days he completely recovered and even the attending doctor said three words DIE ANOTHER DAY. The nurses also matched their tune with the doctor DIE ANOTHER DAY. Many dead bodies in the hospital made him realise the true value of life. It is said that adversity always presents opportunities for introspection. He returned to his rented room and planned not to DIE ANOTHER DAY but live one day more to serve people, to serve humanity.

He had studied hard for continuous one year and sat for the medical exam. He stood first in the medical exam and later become a famous heart specialist. He also founded a famous private hospital in Kolkata where many foreign heart specialists were hired for treatment of patients. Eight years had passed in the process. His heart always yearned for his family, his sweet mother, his loving father. But how could he return to his family. He had betrayed his family.

One day an old lady came to the hospital for heart treatment but had no money. The attending doctor advised her husband to appeal to the Managing Director of the hospital for concession. The husband of the old lady went to the Managing Director and found that it was his only loving son James. Tear drops knew no bounds from the eyes

of both the son and the father. His mother was given the best treatment and she recovered soon. James became a doctor which his father had wished. He got back his family too. Later he married his true love Rakhi and lived happily thereafter.

One day James was playing with their only daughter Shafia and pretended that he had died. Shafia mockingly told her father to DIE ANOTHER DAY. James scolded his daughter and said that her blood group was AB+ which meant "Always(A) be(B) positive(+)" and advised her to say positive words like LIVE ONE DAY MORE to...

সংযোগ : ১৯৭০ ব্যাচের সঙ্গে 'আনন্দদীপ' সেতু।

নেপাল ২০২৫ : এক ভ্রমণ কথা

গিরিধারী দাস
(প্রবেশবর্ষ ২০০০)

আমি ও আমার সহধর্মিণী (আমার দুই কন্যা শুধুমাত্র রামেশ্বরম সহ দক্ষিণ ভারত এবং ছোট কন্যা অন্ধ্রপ্রদেশ এর মল্লিকার্জুন এবং মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত মহাকালেশ্বর ও ওঁকারেশ্বর-এ আমাদের যাত্রা সঙ্গী হিসাবে থেকেছে) ২০২১ সালে সঙ্কল্প নিয়ে রামেশ্বরম থেকে শুরু করে এবং ২০২৫-এ মহারাষ্ট্রের ভিমাশঙ্কর দর্শন শেষে দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও উত্তরাখণ্ড চার ধাম (কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী) দর্শন সম্পূর্ণ করলাম। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, ট্যুর অপারেটর-এর সাথে গ্রুপ ট্যুর অথবা কোনো দলের সাথে না গিয়ে শুধুমাত্র আমরা দুজন আবার কখনো আমাদের দুজনকে সাথে নিয়ে ট্রেনে চড়ে বেরিয়ে পড়েছি ভারত দর্শনের উদ্দেশ্যে। এত বড় আমাদের দেশ, এত ভাষা, এত মত, ভিন্ন জীবনশৈলী, প্রত্যক্ষ করেছি, ভালো লেগেছে; দেশের বিভিন্নতাকে উপভোগ করেছি, একাত্ম হয়ে গেছি। গুরুজনদের আশীর্বাদ এবং ছোট, বড় সবার ভালবাসা ও শুভেচ্ছায় এতদিন কোনরকম কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

হিমালয়ের কোলে অবস্থিত আমাদের ছোট্ট প্রতিবেশী দেশ নেপাল। কথিত আছে, দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ ও উত্তরাখণ্ড চার ধাম (কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী) দর্শনের পর নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে অবস্থিত পশুপতিনাথ দর্শন না হওয়া পর্যন্ত একজন তীর্থযাত্রীর দর্শন-যাত্রা সম্পূর্ণ হয় না। তাই এবার ৬ সেপ্টেম্বর বেরিয়ে পড়লাম নেপাল-এর উদ্দেশ্যে। আমরা দু'জন এবং আমাদের গ্রামের এক মধ্যবয়সী যুগল নীলাদি ও জগদীশদা।

ভারতের রক্সোল থেকে নেপালের কাঠমাণ্ডু সবচেয়ে কাছে এবং যোগাযোগ ভাল, কিন্তু আমরা ট্রেন যোগে বিহারের জয়পুর হয়ে পরদিন সকাল ১১:০০ টা

নাগাদ নেপালের জনকপুর (রাম-সীতার বিবাহস্থল) পৌঁছালাম। স্টেশন থেকে বেরিয়ে প্রথমেই নেপালের সিম (খবর পেলাম নেপালে আগের দিন থেকে ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটস্যাপ সহ প্রায় সব সোস্যাল নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বন্ধ—কারণ এগুলো থেকে নেপাল সরকার কোনো লভ্যাংশ পায় না। আমি নেপাল টেলিকম-এর সিম নিলাম যেহেতু এতে হোয়াটসঅ্যাপ চলছে এবং আমি হোয়াটসঅ্যাপ থেকে কল ও চ্যাট উভয়ই করতে পারব।) এবং কিছু নেপালি টাকা সংগ্রহ করে মা সীতার বাপের বাড়ি এলাকার দর্শনীয় স্থানগুলো চাক্ষুষ করতে টোটো ধরে রওনা হলাম। সারাদিন দর্শন শেষে সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ প্রাইভেট বাসে উঠে বসলাম, গন্তব্য কাঠমাণ্ডু, পশুপতিনাথ।

ভোর ৫টা নাগাদ কাঠমাণ্ডু, হোটেল (মন্দিরের পাশেই) নিয়ে একটু বিশ্রাম, ফ্রেশ হয়ে নতুন পোশাক পরে চারজনে চললাম আমাদের চিরাকাঙ্খিত পশুপতিনাথ দর্শনে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দীর্ঘ লাইন পেরিয়ে মহাদেবের দর্শন পেয়ে একইসাথে আপ্লুত, অভিভূত ও নিজেকে ভাগ্যবান মনে হল। প্রভুকে কোটি কোটি প্রণাম ও ধন্যবাদ জানিয়ে মন্দির থেকে বের

হলাম, তখন বেলা দু'টো। দুপুরের ভোজন সেরে একটা ক্যাব বুক করলাম, চুক্তি অনুযায়ী আমাদের সারথী কাঠমাণ্ডুর প্রসিদ্ধ স্থানগুলো দর্শন করিয়ে পরবর্তী গন্তব্য পোখারা-র বাসে তুলে দেবে। সন্ধ্যা ৭:৪০ নাগাদ পোখারা-র বাস ছাড়ল এবং ভোর ৪:০০ নাগাদ ফেওয়া লেক-এর শহর পোখারা পৌঁছে গেলাম। সারাদিনের সাইট সিন-এর উদ্দেশ্যে ওখানের স্থানীয় প্রসিদ্ধ ট্রাভেল এজেন্সি পরিচালিত একটি ১৭ সিটের গাড়িতে উঠলাম। এতদূর পর্যন্ত সব ঠিক, কোথাও কোনো সমস্যা নেই।

দু-তিনটি স্পট দেখানোর পর গাইড ভদ্রমহিলা আমাদের বললেন, শহরের কোথাও কোথাও একটু ঝামেলা চলছে (সোস্যাল নেটওয়ার্ক প্লাটফর্ম বন্ধের প্রতিবাদে ইয়াং জেনেরেশন আন্দোলন করছে), গাড়ি নিয়ে যাওয়া সমস্যা হতে পারে, তাই হয়ত সব সাইট কভার করা সম্ভব হবে না। ঠিক আছে, সব কভার না করলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু প্রধান প্রধান সাইটগুলো দেখানোর চেষ্টা করুন। অবশ্যই চেষ্টা করব... গাইড ভদ্রমহিলা জানালেন। অবশেষে, অনেক ঘুরপথে পাঁচটি সাইট দেখানোর পর, নেপালের পুরাতত্ত্ব বিভাগের একটি সংগ্রহশালায় আমাদের ভ্যান থামল এবং গাইড জানালেন আমাদের স্থানীয় ভ্রমণ এখানেই সমাপ্ত।

সারা শহর জুড়ে আগুন জ্বলছে, গাড়ি আর যাবে না। আমরা নিজেদের হোটেলে পৌঁছাব কিভাবে? সবাই চিন্তিত। অত্যন্ত দায়িত্বশীল আমাদের গাইড জানালেন, আমরা লেক সাইড রোড থেকে প্রায় সাত কিলোমিটার দূরে আছি, ওঁর সাথে হাঁটতে হবে। তবে দু-তিন জন বয়স্ক ছিলেন, তাদের জন্য স্কুটি ব্যবস্থা হল। শুরু হল পদযাত্রা, গাইড-এর পেছনে আমরা প্রায় ১৪ জন জেন জ়ি-র আন্দোলন প্রত্যক্ষ করতে করতে হাঁটছি। একদল যুবক, সবার কালো পোশাক, সবার হাতে অস্ত্র, উল্লাস করতে করতে দুরন্ত গতিতে বাইক চালিয়ে আমাদের ক্রস করল। অনেকের বারণ সত্ত্বেও আমি আমার ফোনে ভিডিও করছি। একটা স্করপিও রাস্তার উপর দাউ দাউ করে জ্বলছে, পোখারা কোর্ট ভেঙে ফেলেছে, নথি-পত্র এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে... আগুন জ্বলছে, হোটেল, মল, সরকারি অফিস সব জ্বলছে... চারিদিকে শুধু আগুন, ধোঁয়া, পোড়া গন্ধ; সে এক ভয়াবহ দৃশ্য। আমরা (আমি আর আমার সহধর্মিণী একসাথে, আর কেউ না) সারা ভারত ঘুরে বেড়িয়েছি, কোথাও কোন সমস্যা হয়নি বা এমন ঘটনার সম্মুখীন হইনি। প্রায় এক ঘন্টা হেঁটে আমাদের হোটেলে পৌঁছালাম, এখানেও প্রচুর মানুষের ভিড়। দেখি, আমাদের পাশের দুটি হোটেল পরের সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর হোটেলটা তছনছ করা হচ্ছে, এটাতেও অগ্নিসংযোগ হলো। নেপালের সাধারণ জনগণ উল্লসিত, বেশিরভাগের এই আন্দলনে সায় আছে। কারণ! আমাদের হোটেল ম্যানেজার এর সাথে কথা বলে জানলাম, এই আন্দোলন আসলে নেপালের সাধারণ মানুষের আন্দোলন, দেশের যুব সম্প্রদায় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। নেপালের নেতা-মন্ত্রী থেকে আমলা যারা যথেচ্ছ ভ্রষ্টাচার চালিয়েছে, দেশের উন্নতির কথা না ভেবে নিজেরা বড় বড় হোটেল, শপিং মল, রেস্টোরেন্ট বানিয়েছে , দীর্ঘদিনের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তাদের সবার বিরুদ্ধে।

আমরা হোটেলের ঘরে বসে আছি, লোডশেডিং... টিম টিম করে একটা সোলার লাইট জ্বলছে। হঠাৎ দুম করে বিরাট আওয়াজ, আবার দুম... পাশের হোটেলে মজুত থাকা গ্যাস সিলিন্ডার ব্লাস্ট করছে। এবার ভয় পেলাম, একদম সত্যি... প্রথমবার ভয় পেলাম। পাশের হোটেল, যেটা জ্বলছে আমাদের থেকে খুব বেশি হলে ২০০ মিটার দূরে, আমাদের হোটেলে কাচের জানালা, ছিটকে এলে আর রক্ষে নেই। রাত এগারোটা নাগাদ প্রচণ্ড জোর বৃষ্টি শুরু হল, জেন-জ়ি রা রণে ভঙ্গ দিল। ভোরের দিকে একটু ঘুমালাম, সকালে উঠে খাবার জলের সন্ধানে বাইরে বেরিয়ে দেখি চারিদিকে ধ্বংসস্তূপ, রাস্তায় সেনা নেমেছে। ২০ টাকার জল ৩৫ টাকায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। সৌভাগ্য, সকাল ১০টা নাগাদ কারেন্ট এলো, মোবাইল চার্জ করেই খবর দেখলাম, নেপালের সেনারা পরিস্থিতি মোকাবিলায় সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করেছে। ভারত সরকার বর্ডার সিল করেছে এবং পরিস্থিতির উন্নতি বা সরকারি ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয়দের আপাতত হোটেলেই থাকার পরামর্শ

দেওয়া হয়েছে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের ফোন (হোয়াটসঅ্যাপ মাধ্যমে), হোস্টেল পরিবার এর সূত্রে সুনীত, অরূপ, রঞ্জিত, কৌশিক, সৌমেন, রাজেশ, অরবিন্দ, মুরারী, আম্বিয়া, বুবুলদা, শোভনদা-র ফোন এসেছে, সকলে চিন্তিত; আমরা ভালো আছি, সেফ আছি—সবাইকে জানালাম।

বিকেলে আমরা চারজন হোটেলের কাছেই ফেওয়া লেকে বেড়াতে গেলাম, জেন-জ়ি দের সাথে কথা বললাম, ওরা আশ্বস্ত করল, সব ঠিক হয়ে যাবে, আমাদের কোনো চিন্তা নেই। প্রসঙ্গত জানাই যে, নেপালের সাধারণ মানুষ ভীষণ ভদ্র, ভারতীয়দের প্রতি একটা আলাদা ভালোবাসা আছে। তিনদিনের মাথায় নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রী পরিষদ গঠন হলে, নেপাল-ভারত বর্ডার খুলল। ১৩ তারিখ ভোরে আমরা সনৌলী বর্ডার হয়ে ভারতে প্রবেশ করলাম এবং উত্তরপ্রদেশ-এর গোরখপুর থেকে রাত ৮.৩০ টায় আসানসোলগামী ট্রেনে (রিজারভেশন করা ছিল) চড়ে সাথে করে একগাদা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম... ফিরে এলাম, আবার কোনো নতুন ঠিকানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ব বলে।

নাটক

মুখোশ রাজ্যের গল্প

সুরজিৎ রায়

(প্রবেশবর্ষ ১৯৯৫)

প্রথম দৃশ্য

(রাজসভা। রাজার আসন ফাঁকা। মন্ত্রী, দুই দ্বাররক্ষক আর একপাশে মেঝেতে বসে দূত ঢুলছে। রাজা ঢুকলেন।)

রাজা : মন্ত্রী বলো, রাজ্যের খবর নিশ্চয় ভালো?

মন্ত্রী : এমনি সব ভালো... তবে... রাজদূত বলছিল...

রাজা : আবার তবে। এই তবেগুলো যাবে কবে? কোথায় দূত?

মন্ত্রী : (এপাশ ওপাশ খুঁজে) এই কোথায় রে? অদ্ভুত! (খুঁজে পেয়ে দূতকে ঠেলা দেয় মন্ত্রী। দূত ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ায়।)

দূত : মহারাজের জয় হোক। আজ্ঞে?

রাজা : (দূতের হালচালে বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গী) যাকগে, কি বার্তা?

দূত : আজ্ঞে কর্তা, থুড়ি মহারাজ... ইয়ে প্রজারা... মানে প্রজাদের... মানে সবাই না, কেউ কেউ বলছিল...

রাজা : বেশি কথায় যায় সময়, (ধমকে) বল এক কথায়।

দূত : প্রজা অসন্তোষ।

রাজা : এদের একটাই দোষ, কথায় কথায় অসন্তোষ। বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিপ্লব... শেষ পর্যন্ত কি দেয় এসব? পোড়া ছাই। তাই থেকেই আবার জন্ম নেয় চাঁই - নায়ক, একক। (দূতের দিকে) কেন?

দূত : (হতবুদ্ধি) কেন?

মন্ত্রী : আহা! কোলের ছানা যেন। কেন প্রজা অসন্তোষ বল।

দূত : আজ্ঞে অনুপ্রবেশ। কালো নাগরিকের দল।

রাজা : হুঁ, গোল পাকিয়ে গদি দখলের ছল। দেখা দরকার কে মাথাটা খায়।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী : (মাথা ঝুঁকিয়ে) বণিকশ্রেষ্ঠ দেখা করতে চায়।

মন্ত্রী : আঃ। বলে দে পরে।

রাজা : বণিকশ্রেষ্ঠ? আরে! যা নিয়ে আয় তারে। শোনো মন্ত্রী, এই বণিকের দল, ক্ষেপলে সব অচল।

(বণিকের প্রবেশ)

বণিক : (মাথা ঝুঁকিয়ে প্রণাম করে) মহারাজের জয় হোক।

রাজা : জয়, সে কি এমনি হয়? রাজ্যের এই এত উন্নয়ন, কে দায়ী? এ রাজ্যের ব্যবসায়ী। (বণিক আবার একপ্রস্থ প্রণাম করে আসন গ্রহণ করে। রাজা ইশারায় বলতে অনুমতি দেন।)

বণিক : মহারাজ, এ রাজ্যে ব্যবসা আমার চোদ্দ পুরুষের। এ রাজ্যের পণ্যের গুণমান শ্রেষ্ঠ, এ সর্বত্র সুবিদিত। এখানে বাণিজ্যের পরিবেশ অনুকূল। তার ওপর যে রাজ্যের রাজা এমন সর্বগুণসম্পন্ন, সে তো বণিকের স্বর্গ মহারাজ।

রাজা : সেবার যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি-শ্রেষ্ঠী, তোমার জন্যে গায়ে লাগল না রেশটি।

বণিক : সেদিন আর নেই মহারাজ। বাণিজ্যে এখন মন্দা।

রাজা : সেকি! তোমার বাজার মন্দা, মগের মুলুক নাকি? কেন?

বণিক : মহারাজ, সে কথা বলতেই আসা। ভিনরাজ্যের কালো ব্যবসায়ীরা এ রাজ্যে এসে বাজার নষ্ট করছে। অস্বাভাবিক সস্তায় দিচ্ছে। বাইরের

চেহারা একদম আমাদের ভালো পণ্যের মতো। ক্রেতারা কিনে নিচ্ছে। অথচ ওগুলো গুণমানে খারাপ, আমরা পরীক্ষা করে দেখেছি।

রাজা : এ তো সমাধান সোজা। প্রজা, মানে তোমার ক্রেতা, একবার ঠকলেই চিনবে কালো বিক্রেতা। ওরা ফিরবে, তোমার কাছেই ভিড়বে।

বণিক : ক্রেতারা আমাদের, মানে সাদা বণিকদেরও সন্দেহ করে। বাজারে অচলাবস্থা। সমস্যা অনেকদূর মহারাজ। তাছাড়া কালো বণিকদের চালচুলো নেই, এ রাজ্যের পরিচয় নেই, ঠিকমত রাজকর দেয় না।

(রাজা গম্ভীর মুখে উঠে পায়চারি করেন।)

বণিক : একটা বিহিত চাই। নতুবা সাদা বণিকেরা এ রাজ্যে আর ব্যবসা করতে চায় না, রাজন।

রাজা : (পায়চারীরত) ক'জন?

বণিক : আজ্ঞে?

মন্ত্রী : কালো বণিক কতজন?

বণিক : অনেক, অগুণতি।

রাজা : সেনাপতি।

(দৌড়ে সেনাপতির প্রবেশ)

সেনাপতি : আজ্ঞে, মহারাণা ?

রাজা : পাহারায় কি গাফিলতি সীমানা?

সেনাপতি : নাতো, না না। তিন হাজার অতন্দ্র প্রহরা।

রাজা : তারা কি সব বেতো ঘোড়া? খায়, আর দাঁড়িয়ে ঘুমায়?

(পায়চারি করেন রাজা। সেনাপতি নতমুখে দাঁড়িয়ে।)

শোনো সেনাপতি। আজ থেকে প্রহরা, চতুর্গুণ কড়া। আর যত আছে ভিনদেশী ফড়ে, তাড়িয়ে দাও ঘাড় ধরে।

মন্ত্রী : এ আর এমন কি কাজ।

সেনাপতি : এ ... এ প্রায় অসম্ভব, রাজ।

রাজা : (হুঙ্কার) কেন?

সেনাপতি : যদি ধরা প'ড়ে কোনো লোক, বলে "মহারাজের জয় হোক", কি বলে তাড়াই, ঠিক পরিচয় ছাড়াই ? মানুষের মুখের ওপর, লেখা নাই সাধু না চোর।

(রাজা দ্রুত পায়চারি করতে করতে হঠাৎ থামলেন।)

রাজা : বেশ। শোনো আদেশ। এ রাজ্যে মানুষের পরিচয়, আজ থেকে মুখ নয়, মুখোশ।

সবাই : মুখোশ!!

রাজা : হ্যাঁ মুখোশ। আমার মুখের আদলে, সব্বার মুণ্ডুতে থাকবে মুখোশ, মুখের বদলে।

মন্ত্রী : কিন্তু ... এতো তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত...

রাজা : অভ্রান্ত।

মন্ত্রী : মহারাজ...

রাজা : কোনো কথা নয় মন্ত্রী, এখন কাজ। এক দান, সব সমাধান। (চেঁচিয়ে) জারি করো ফরমান, মুখ নয়, মুখোশ পরিচয়। (গলা নামিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ ভঙ্গিতে) এইভাবে ইতিহাস লেখা হয় ... (বণিকের দিকে) বণিক সর্দার, দেরি নয় আর। বানাও লক্ষ মুখোশ। খরচ দেবে রাজকোষ। (রাগী স্বরে) কেউ কিছু বলবে ?

মন্ত্রী ও সেনাপতি : না না, চলবে, চলবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(বাজার। আটজন সাধারণ নাগরিক। ক্রেতা, বিক্রেতা, পথচারী। নীরবে হাতের ইশারায় কথোপকথনে রত। ঘোষকের বক্তব্য শুরু হওয়া মাত্র সবাই ফ্রিজ।)

ঘোষক : (নেপথ্যে) শোনো শোনো শোনো...

(ঘোষকের প্রবেশ) রাজার আদেশ। আগামী কাল সকল রাজ্যবাসী রাজবাড়ির সামনের মাঠে হাজির হবে। সকল সাদা প্রজাকে একটি করে মুখোশ দেওয়া হবে। আগামী পরশুদিন থেকে এই রাজ্যে থাকতে হলে মুখে সেই মুখোশ পরে থাকতে হবে। মুখোশবিহীন কালো নাগরিকদের রাজ্যের সীমানার বাইরে যেখানে ইচ্ছে চলে যেতে আদেশ দেওয়া হচ্ছে। মুখোশ ছাড়া মুখ দেখলেই হাজতে পোরা হবে। রাজার আদেশ।

(ঘোষকের প্রস্থান। আটজন বিস্ময়ে তাদের আগের কথার খেই হারিয়ে এদিক ওদিক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।)

তৃতীয় দৃশ্য

(স্টেজের পেছন দিকে দু'জন প্রহরী মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে। ঢং করে ঘণ্টা পড়ল। প্রহরীদের সামনে দিয়ে মানুষের লাইন ঢুকে পড়ল স্টেজের মধ্যে। প্রহরীরা লাইন সামলাতে শুরু করল। সেনাপতি দু'জন মুখোশ পরা প্রহরী নিয়ে ঢুকল। ফ্রন্টস্টেজের একপাশে দাঁড়িয়ে তারা মুখোশ বিলির প্রস্তুতি শুরু করল। ফ্রন্টস্টেজের অন্যপাশে এসে দাঁড়াল উস্কোখুস্কো চুলের এক পাগল। পরনের পোশাক মলিন।)

পাগল : এক যে ছিল পাগলা বুড়ো, ভাতে খেত লঙ্কাগুঁড়ো। (হিহি হাসি)
তার যে জামাই লম্বা দাড়ি, খেত শামুক, গুগলি, গেঁড়ি। (মিথ্যে ওয়াক, হিহি হাসি)
কাল ছিল অগোছালো, আজ হবে সাদা-কালো।
ওরে, কাল ছিল রামধনু রঙে আলো
আজ নাকি হয়ে যাবে সাদা-কালো...
(রাজার প্রবেশ। পাগলকে প্রহরী ধাক্কা মেরে একপাশে সরিয়ে দেয়। পাগল হাঁ করে কাণ্ডকারখানা দেখতে থাকে।)

রাজা : শোনো প্রজারা শোনো, সন্দেহ নেই কোনো
আমার ভাবনা নির্ভুল, বিচ্যুতি নেই একচুল।
সাদা নাগরিক থাকবে, কালো নাগরিক ভাগবে।
বলো, মুখোশ রাজ্যের জয়।

জনতা : মুখোশ রাজ্যের জয়।
(রাজার প্রস্থান। মুখোশ বিলি শুরু।)

প্রজা-১ : মহারাজের জয় হোক।

সেনাপতি : না। স্বয়ং মহারাজের নিদান, আজ থেকে বদলাবে শ্লোগান। রাজা নয়, মন্ত্রী নয়, রাজ্যের জয়গান। বল ''মুখোশ রাজ্যের জয়''।

প্রজা-১ : মুখোশ রাজ্যের জয়।
(প্রজা-১ মুখোশ পেল। মুখে পরে প্রস্থান।)

প্রজা-২ : মুখোশ রাজ্যের জয়।
(প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে। লাইনে ধাক্কাধাক্কি প্রবল। প্রহরী লাইনটাকে আঁকাবাঁকা করে দেয় স্টেজজুড়ে। ধাক্কাধাক্কি চলতে থাকে। প্রহরীরা লাঠি উঁচু করে সামলাতে থাকে...)

প্রজা ১০ : (গম্ভীর গলা) মুখোশ রাজ্যের জয়।

সেনাপতি : তোর গলা রাগ রাগ। মুখোশ পাবি না, ভাগ।

প্রজা-১০ : কেন ?

সেনাপতি : (হুঙ্কার) কি ?
(একজন প্রহরী প্রজা ১০ কে ঘাড় ধরে বার করে দেয়।) (প্রক্রিয়া চলতে থাকে।)

প্রজা-১৫ : মু-মু-মুখোশ রা-আজ্যের জ-অয়।

সেনাপতি : (ধমক) গলা কেন কাঁপে সামান্য সংলাপে? তুই ফেল। দেশ ছেড়ে এক্ষুনি পালা, নইলে জেল।
(প্রজা ১৫ একটু অবাক হয়ে থেকে কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে যায়।) (প্রক্রিয়া চলতে থাকে। নীরব অভিনয়।)

পাগল : কৃষক মজুর ব্যবসাদার, সবার মুখে মুখোশ-ভার
যারা পাগল আবোল তাবোল, তাদের মুখোশ কি দরকার?

চতুর্থ দৃশ্য

('ক' এক সাধারণ লোক। মুখে মুখোশ। হাতে বাজারের ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছে। পেছন থেকে মুখোশ পরা আরেক সাধারণ লোক 'স' ডাকল। পেছনে পাগলের প্রবেশ।)

স : আরে 'দ' যে। ও ভায়া, বাজার হল?

ক : 'দ' কাকে বলছো হে? চোখের মাথা খেলে নাকি? (মুখোশ মাথায় তুলে) আমি 'ক'। চোখটা কবিরাজকে দেখাও, বুঝলে 'দন্ত্য ন'।

স : (একটু থেমে) তা দেখাবো, আর তোমাকেও নিয়ে যাব। আমি 'ন' হলাম কবে থেকে হে? (মুখোশ মাথায় তোলে)

ক : এ হে হে। ভাই 'দন্ত্য স' ভুল হয়ে গেছে।

স : ভুল তো হবেই। শোনো ক, আমরা রাজার আইনের ফাঁসে কানামাছি খেলছি।

ক : সে একটু অসুবিধা হলেও বুদ্ধিটা মহারাজ বেশ দিয়েছে। আমরা ঠিক থাকব, বুঝলে 'দন্ত্য স'। কালোগুলোর সর্বনাশ হবে।

স : মোটেও ঠিক থাকবো না। আমরা সবাই বোড়ে বুঝলে, শতরঞ্জের বোড়ে।

ক : আমাদের ভালো হবে হে। আমরা তো সাদা বোড়ে।

(একজন মুখোশ পরা প্রহরীর প্রবেশ। 'ক' ও 'স' মুখের ওপর মুখোশ নামিয়ে নেয়। 'স' হাঁটতে থাকে। 'ক' দৌড়ে 'স' এর সঙ্গ নেয়)

ক : আমাকে ফেলে যেও না, ও 'দন্ত স' ভাই।

('ক' ও 'স' এর প্রস্থান। পেছনে প্রহরীর প্রস্থান।)

পাগল : মুখোশ পরে রাস্তা চলিস, মুখোশ ঢেকে কথাও বলিস মনের জন্য মুখোশ চাই? ঘরের ভিতর মুখোশ নাই।

(মুখোশ ছাড়া একজন কৃষক দৌড়ে ঢুকল এবং মাটিতে পড়ে গেল। পেছনে তাড়া করে ঢুকল মুখোশধারী প্রহরী। পাগল চমকে সরে দাঁড়াল।)

প্রহরী : এই দাঁড়া, মুখোশ ছাড়া মাথা।

কৃষক : সত্যি বলছি কোটালভাই, ফসল কাটার মরশুম। কাল দেরি হয়ে গেছিল। মুখোশ পাইনি।

প্রহরী : তো আজ বেরলি কেন? ছাড়ান নাই।

কৃষক : না বেরলে ফসল কে কাটবে? সারা বছর খাব কি? আজ ছেড়ে দাও।

প্রহরী : মুখোশ ছাড়া বেরনোর হুকুম নাই। তুই ভিন রাজ্যের লোক, কালো প্রজা।

কৃষক : কি বলছ কোটালভাই! আমার বাপ ঠাকুদ্দা চোদ্দ পুরুষ এই রাজ্যের। (হাত তুলে) মুখোশ রাজ্যের জয়। এবার ছেড়ে দাও। (প্রহরী স্থির) আমি এই রাজ্যের মানুষ। এই মাটি আমাকে খেতে দেয়। মাটি ছুঁয়ে বলছি। এই তোমার বল্লম ছুঁয়ে...

প্রহরী : (বল্লম তুলে উদ্যত) খবর্দার! বল্লমে হাত দিবি তো সোজা ফুঁড়ে দেবো। এই বল্লম আমাকে খেতে দেয়। ওঠ ... সোজা চল।

(বল্লমের সামনে কৃষক, পেছনে প্রহরী সমেত প্রস্থান। প্রত্যক্ষদর্শী পাগল সচল হয়।)

পাগল : আকাশটাকে মুখোশ দাও, বাতাসদেরও মুখোশ চাই। দুঃখ, সেও মুখোশ ঢাকা, ক্ষিদে ঢাকার মুখোশ কই? (লাস্ট লাইন ডিলেইড ইকো)।

(স্টেজের পেছন দিকে ঘুমিয়ে পড়ে পাগল। আলো কমে। স্পটলাইট জ্বলে। চারকোণ থেকে কালো জামা পরা চার মুখোশধারী ব্যাক্তির প্রবেশ। হাঁটা চলায় সতর্কতা।)

এ : আমি এ। প্রত্যেকের নাম বলো। (পাগল জেগে উঠে বসে)

বি : (হাত তুলে) বি।

সি : (হাত তুলে) সি।

ডি : (হাত তুলে) ডি।

এ : যাক। সবাই মুখোশ পেয়েছো তাহলে। মুখোশ খোলো। (এদিক ওদিক তাকিয়ে সবাই মুখোশ খোলে।)

বি : (ব্যাঙ্গ করে) মুখ নয় মুখোশ পরিচয়। নে এবার দ্যাখ, কোন মুখের কি পরিচয়। হুঃ, আমাকে রাজ্য থেকে তাড়াবে।

সি : এই শোন, ছোট মুখোশে বড় কথা বলিস না। তোর এক মজুরকে টাকা দিয়ে তো ওর মুখোশটা ধার নিয়েছিস।

বি : তুই বা কোন মুখোশে এসব কথা বলছিস? তোরটা কোন ভাগচাষির থেকে ঝাড়া বলব?

সি : কি? যত বড় মুখোশ নয় তত বড় কথা।

এ : বন্ধুগণ, ঝগড়ার সময় এটা নয়। এখন আমাদের সাবধান থাকতে হবে। এক থাকতে হবে। আমরা একদিন আমাদের নিজেদের রাজ্য ছেড়ে এই রাজ্যে এসেছিলাম ঠিকই। কিন্তু এখন? এখন তো আমরা এই রাজ্যের মানুষ হয়ে গেছি।

ডি : তুমি ঠিক বলছ এ ভাই। আজ আমরা এই রাজ্যের সুখে দুখে জলে বাতাসে মিশে গেছি। অথচ আজো আমরা কালো নাগরিক। আজ ঠিক

আছি, কিন্তু কাল কি হবে জানিনা।

এ : জেনে রাখো বন্ধুরা, এই রাজ্যে যতগুলো মুখ ততগুলো মুখোশ কিন্তু নেই। বাইরে মুখোশের হাহাকার। আমরা যে কেউ ধরা পড়তে পারি যে কোনো দিন। আমাদের সবাইকে এক হয়ে থাকতে হবে। সেজন্যেই আজকের এই গোপন সভা। তোমরা বলো কে কি ভাবছো। এ রাজ্যে থাকবে না চলে যাবে?

ডি : আমি তোমাদের মত রাজনীতিক, বণিক বা জমির কারবারি নই। আমি শিল্পী। শিল্পের টানে এই রাজ্যে এসে এই মাটির টানে পড়ে গেছি। চলে যাও বললেই কি চলে যাওয়া যায়? আমি আছি।

বি : আমিও আছি।

সি : আমরা থাকব।

এ : এইতো, এটাই দরকার।

পাগল : (আচমকা লাফিয়ে উঠে) একশোবার, একশোবার।

(এ, বি, সি, ডি চমকে মুখের ওপর মুখোশ পরে ঝটপট যে যেদিকে পারল বেরিয়ে গেল।)

পাগল : (হতাশা) যাব্বাবা!
ডাইনে মুখোশ, বাঁয়ে মুখোশ, রাজ্য হল মুখোশময়।মুখগুলো সব কেমন আছে? তাদের জন্য চিন্তা হয়।

পঞ্চম দৃশ্য

(রাজসভা। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি, মুখোশ পরা দুই প্রহরী, দূত)

রাজা : মন্ত্রী বলো, সমস্যা কি দূর হল?

মন্ত্রী : আজ্ঞে মহারাজ, মুখোশ রাজ্যের জয়। তবে সংবাদ ভালো নয়।

রাজা : কেন? উপায় দিলাম যেন, রাজ্যের ভালো হয় সাদা প্রজা রয়, কালো প্রজা দূর হয় তাও সংবাদ ভালো নয়? কে কয়?

মন্ত্রী : আজ্ঞে আমি নয়, রাজদূত।

রাজা : ধুত, এ আবার দূত! চর চর। দাও ভালো খবর।

দূত : মুখোশ রাজ্যের জয়। আজ্ঞে, ভালো খবর বোধহয়... (নিজের মনে একটু ভাবে। হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়।) মুখোশ পরে কেউ কাউকে চিনতে পারছে না। ভালো খবর কিনা? ভালোই হয়েছে। (নিজেই হাততালি দেয়)

মন্ত্রী : (সামান্য শ্লেষাত্মক) সবাই ভালোই রয়েছে।

রাজা : প্রথমে সমস্যা হবে, পরে সুফল পাবে। তারপর?

দূত : হ্যাঁ ইয়ে... ভালো খবর হল গিয়ে... অধিকাংশ কালো, মুখোশ জোগাড় করে হয়ে গেছে ভালো, মানে সাদা প্রজা। কি মজা। (একা হাততালি)

(নেপথ্যে একটা মৃদু গন্ডগোলের আওয়াজ। আওয়াজটা ক্রমশ বাড়ছে)

রাজা : (রেগে) অত সোজা? (দূতের হাততালি বন্ধ আচমকা) সেনাপতি, এ রাজ্য ছেড়ে ভেগেছে কটা?

সেনাপতি : প্রা...য় দশ বারো গোটা।

রাজা : বলো কিহে। দশ হাজার না শত?

সেনাপতি : আজ্ঞে না হুজুর, বারো জন মত।

রাজা : কি? মোটে বারো? কয়েকশো কালো প্রজা খুঁজে বার করো। নয়ত, পদ ছাড়ো।

মন্ত্রী : (দূতকে) তুই এখনো দাঁড়িয়ে কেন? কিছু আছে আর? বলার?

(গণ্ডগোলের আওয়াজ জোরাল।)

দূত : শেষ সমাচার। না পেয়ে মুখোশ, জনরোষ। মারামারি রাস্তায়। মুখে, মুখোশে, পেয়াদায়। আসি মহারাজ, বিদায়। (দৌড়ে বেরিয়ে যায়)

(নেপথ্যে সোরগোলের কথাগুলো স্পষ্ট। 'মুখোশ পাইনি', 'রাজ্য ছেড়ে পালা', 'চুরি গেছে', 'আমাকে দেয়নি' 'মুখোশ ছাড়া মুখ, মানে হাজত'...। উত্তেজিত ভিড় স্টেজের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে। একজন প্রহরী ওদের আটকে রাখার চেষ্টা করে।)

রাজা : (উচ্চস্বরে) প্রহরী দেখো তো, কারা করে বিরক্ত।

মন্ত্রী : (ব্যাঙ্গে) রাজভক্ত।

(দ্বিতীয় প্রহরী এগিয়ে দেখে ফিরে আসে। উত্তেজিত ভিড় উইংসের কাছাকাছি। ভিড়ের নীরব অভিনয়।)

প্রহরী : মুখোশ ছাড়া, পড়ছে যারা ধরা। বেশিরভাগ কৃষক আর মজুর, হুজুর। ওরা এখনো মুখোশ পায়নি।

রাজা : নিয়ম রয়েছে আইনি, মুখোশ ছাড়া বেরনো মানা। ওরা কি জানেনা? মুখোশ পায়নি মানে?

মন্ত্রী : কথাটা কি ঢুকল মহামান্য সেনাপতির কানে?

সেনাপতি : আজ্ঞে মহারাজ শ্রেষ্ঠীর দোষ। তৈরি হয়নি যথেষ্ট মুখোশ।

(বণিকের প্রবেশ ব্যাস্তভাবে)

বণিক : উপস্থিত মহারাজ, আপনার অনুগত। হাজার মুখোশসহ সময়মত।

(বণিকের পেছনে ঢুকছে বিরাট এক বস্তা মাথায় মুটে। মাথার ভারে টলছে।)

রাজা : অদ্ভুত সময়জ্ঞান শ্রেষ্ঠী তোমার।

(রাজা আসন থেকে উঠে আসেন হাত বাড়িয়ে। মুটের সঙ্গে ধাক্কা। দুজনেরই পতন। বস্তা রাজার মাথার ওপর দিয়ে গড়িয়ে যায়। বস্তা খুলে কিছু মুখোশ বেরিয়ে যায়। মুটে ওঠে। রাজা ওঠে না। সবাই ফ্রিজ দু' সেকেন্ড। ভীড়ের ভেতর থেকে প্রহরীর বল্লমের ফাঁক গলে পাগলের প্রবেশ। পড়ে থাকা মুখোশের স্তূপ থেকে একটা মুখোশ তুলে মুখে পরে। ইশারায় বাকিদের ডাকে। হঠাৎ জনতা হামলে পড়ে মুখোশের স্তূপের ওপর। উত্তেজিত জনতা দেখে মন্ত্রী আর সেনাপতির পলায়ন। রাজা মানুষ আর মুখোশের ভেতরে চাপা পড়ে যায়।)

(সবাই যখন মনমত মুখোশ বেছে মুখে পরে দেখতে ব্যস্ত, পাগল হঠাৎ "অ্যা...ই" বলে বিকট চীৎকার করে। সবাই থেমে পাগলের দিকে তাকায়।)

পাগল : তোদের রাজা কোথায়?

(সবার খেয়াল হয়। রাজাকে খোঁজে। রাজাকে স্টেজে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুখোশের বস্তার আড়ালেও রাজা নেই।)

পাগল : যাঃ, রাজা নেই ? তাহলে রাজার তৈরি নিয়মও নেই। কিরে হাঁদার দল, কিছু বল।

(সবাই এ ওর মুখের দিকে চায়)

পাগল : ওরে সাদা কালো নয়, আজ আবার সব রঙিন। সবাই এই রাজ্যের মানুষ, এই আকাশের সাত রঙের মানুষ, এই মাটির সাত সুরের মানুষ। (নেচে নেচে) রাজমুখোশের ঘায়, রাজা হারিয়ে যায়। হারিয়ে যদি গেলই রাজা মুখোশ খুলে নাচরে সবাই, নাচের বাদ্যি বাজা।

(সবার মধ্যে আনন্দের চঞ্চলতা তৈরি হয়। নাচের বাজনা বাজে। নেপথ্যে 'মুখোশ খুলে নাচরে সবাই' কথাটার পুনরাবৃত্তি। হৈ হৈ পড়ে যায় স্টেজ জুড়ে।)

পাগল : কষ্ট দিয়ে তৈরি মুখোশ উড়িয়ে দিয়ে আয়
নিজের মুখে হাসবি এবার, সময় চলে যায়...
ওরে আয়রে সবাই আয়রে তোরা আয়...

(উইংস দিয়ে মুখোশ পরা মানুষ ঢোকে। মুখোশ খুলে উপরে ছুঁড়ে দেয়। দর্শকদের দিক থেকেও মুখোশ পরা কয়েকজন স্টেজে ওঠে। মুখোশ খুলে উড়িয়ে দেয়। সবার মুখে হাসি। আনন্দের বান স্টেজময়। ফ্রিজ।)

নেপথ্য থেকে অজানা কণ্ঠ—রাজ্য রাজা মন্ত্রী সব কোথায় যাবে ভেসে, মুখগুলো ঠিক এমনি রবে, উঠবে তারা হেসে।

(নাটক এখানেই শেষ। রাজাকে আর খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল কিনা জানিনা। যেমন জানা যায়নি এ রাজ্যের পরবর্তী রাজার নাম। আসলে, মুখোশ রাজ্যের নামটা আজও একই আছে, নাকি সে নামের ওপর অন্য একটা নামের মুখোশ পরানো হয়েছে সে রাজ্যে—এটাও গবেষণার বিষয়।)

ঋণস্বীকার : হৃদয়ে সত্যজিৎ রায়-এর 'হীরক রাজার দেশে' সিনেমার সংলাপের অনুরণনের প্রভাব এ লেখায় রয়েছে।

টুকরো কথা

সত্যানন্দ ছাত্রাবাস (অফিসিয়াল) গ্রুপের পথচলা শুরু ০৩.০৬.২০২৫। এই গ্রুপের অনেক কথার মধ্যে থেকে এবার নির্দিষ্ট একটি বিষয়ের কিছু কথার স্ফুলিঙ্গ আমরা বেছে নিলাম।

চলো, সকলে মিলে একটু ছোট্ট করে স্মৃতিচারণ হয়ে যাক।

তুমি যখন হোস্টেলে প্রথম ঢুকেছিলে তখন মেস চার্জ কত ছিল? আর, কি রকম খাওয়া দাওয়া হত?

আমি শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়, ১৯৮২। প্রথমে মেস চার্জ ছিল ৭৫ টাকা প্রতি মাসে। সকালে এক গ্লাস চা, দুটো বিস্কুট। দুপুরে ভাত, ডাল, তরকারি, মাছ অথবা ডিম (আধখানা, তবে হাঁসের ডিম)। তখন পোল্ট্রির ডিম পাওয়া যেত না। বিকেলে মুড়ি, ঘুগনি/চপ। রাতে ভাত, ডাল, আলুসিদ্ধ (ডিনামাইট), চাটনি। সিক-মিল বরাদ্দ ৬০ পয়সা। মেনু হাফ পাঁউরুটি, চায়ের গ্লাসের এক গ্লাস দুধ, একটা রসগোল্লা।

—শোভন কুমার মুখোপাধ্যায়, ০৩.০৭.২০২৫

আমি নিরামিষাশী ছিলাম বলে মেস চার্জ ৫০ টাকা ডিসকাউন্ট। আমার লাগত ৩৫০ টাকা। আমার দু'বেলা ডাল, আলুসেদ্ধ। শীতকালে স্যালাড, কোনোদিন বেগুন/ফুলকপি ভাজা। রাত্রে সর্বোচ্চ ৫ জনের জন্য রুটি বরাদ্দ থাকত। তার মধ্যে আমি একজন ছিলাম।

সেকেন্ড ইয়ারের শেষ দিকে আমরা প্রতি বৃহস্পতিবার সবার জন্য নিরামিষ শুরু করেছিলাম। বিশুদার সেই দুর্দান্ত নিরামিষ টক, উফ্‌ফ। অসাধারণ!!

—গিরিধারী দাস, ০৩.০৭.২০২৫

আমার যতদূর মনে পড়ে সেই সময় কি খাব এই নিয়ে খুব একটা কেউ মাথা ঘামায়নি। কি ভাবে মিল শর্ট করা যায় সেটাই মুখ্য ছিল। ১৯৯৮ সালে আলুর দাম বেড়ে গিয়েছিল। বিকল্প হিসেবে দিনে আলুর বদলে কচু। রাত্রে পেঁপে। কিন্তু তাতেও মিল শর্ট। মনে পড়ে বন্ধুরা?

—মলয় দাস, ০৩.০৭.২০২৫

সালটা ২০০২। মেসচার্জ ছিল ৪০০ টাকা। কেবলমাত্র দু'বেলা মিল। ডিম বা মাছ হত। সপ্তাহে সম্ভবত বৃহস্পতিবার নিরামিষ হত। গিরিদা ঠিক বলেছে, নিরামিষ মানেই টক আর মিল শর্ট। চা বা টিফিনটা বাপিদার দোকানে হত সকাল সন্ধ্যা দু'বারই। বাপিদার কথা বলি। বাপিদা কিন্তু আমাদের খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাসনে খাবার দিতেন। প্রত্যহ নতুন তেলে চপ ভাজতেন। টিফিনে থাকত মুড়ি ঘুগনি চপ পিঁয়াজ লঙ্কাকুচি। ৭ টাকা কী ১০ টাকা নিতেন। এছাড়া পাওয়া যেত ব্রেড টোস্ট, ডিম টোস্ট, পোচ। এই পোচ ছিল বাপিদার বিখ্যাত। বাপিদা বলত—দেবো নাকি একটা পোঁচ। চপ ১.২৫ টাকা শুধুমাত্র হোস্টেলের জন্য। আমি, সুব্রত বাড়ি থেকে মুড়ি আনতাম। তাতে কোনোদিন বাপিদার একটা চপ বা ঘুগনি থাকত। সুব্রত ট্যারা ট্যারা আঙুলে মুড়ি মাখাত... সে কি টেস্ট হত। আমাদের ব্যাচে সমস্ত বন্ধুরা সুব্রতর মুড়ি মাখানোটাই পছন্দ করত। মুড়িতে একটু জল ছিটা দিয়ে কি অপূর্ব মুড়ি মাখাত আজও মুখে লেগে আছে। এর পর বলি, নিতাইদার ঘন্টায় রাত্রে খেতে যেতাম। কালে-কস্মিনে শরীর খারাপ হলে নিতাইদা রুটি করে দিতেন। এই সময় কাঁঠাল পাকলে অনেকে অবশ্য টিফিন করতে যেত না, কাঁঠালেই টিফিন সারত। আমাদের ব্যাচে কেবলমাত্র স্বাস্থ্য-সচেতন ছিল বাপ্পাদিত্য। হোস্টেলেও হরলিক্স, আপেল খেত। আমাদের ব্যাচে বাপ্পাদিত্য হোস্টেল জীবনে একটা চ্যাপটার। যাক, অনেক কথা, আবার

কোনো একসময় শোনাব। ধন্যবাদ।

—রঞ্জিত কুমার সেন, ০৩.০৭.২০২৫

১৯৬৬ সালে ১৬ আগস্ট হোস্টেলের প্রথম মিল খাবার সৌভাগ্য যাদের হয়েছিল, আমি তাদের মধ্যে একজন। ঐ সময় সম্ভবতঃ মাসিক ২০ টাকা নির্দিষ্ট চার্জে হোস্টেল কর্তৃপক্ষের পরিচালনায় দু'বেলা খাবার দেওয়া হত। কোন চা টিফিনের ব্যবস্থা ছিল না। পরে সকালে চা দেবার ব্যবস্থা হয় আরো সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে।

রান্না করার একটা টালির ছাদের চালা ছিল। শুরুতে একজন ঠাকুর (রবিদা) ও জনা তিনেক সহযোগী। ঘরের সামনে বারান্দায় খাওয়া।

—জলদবরণ দত্ত, ০৪.০৭.২০২৫

আমার অভিজ্ঞতা শোভনেরই মতো। কারণ ১৯৮১-তে হোস্টেলে আসি। দু'একটা যোগ করছি। মাসের শেষে যে টাকাটা বাঁচত তা বাবা ফাণ্ডে চলে যেত। সে টাকা দিয়ে পরে পিকনিক বা ট্যুরের সাবসিডি দেওয়া হত। তরকারিতে আলুর প্রাধান্য, ফুলকপি যখন প্রথম উঠত, তখন দু'একদিন স্বাদ বদল করতে আনা হত। কিন্তু আলুর তুলনায় তার পরিমাণ এতই কম থাকত, পাতে মালুম হত না। আমরা বিশুদাদের বলতাম, একটা বোর্ডে লিখে দিতে পারো যে আজ অমুকের তরকারি। আবার কোনো কোনো স্বাস্থ্যসন্ধানী মেস ম্যানেজার রাতে ভাত, ডাল আলু করলার তরকারিও করত। মা পরে শুনে বলতেন, আহারে একটা তরকারি, তা আবার তেঁতো। আমাদের অবশ্য ভাত খাওয়ার পরিমাণ কমত না।

—ভূমানন্দ সিনহা, ০৪.০৭.২০২৫

সুখ স্মৃতি তো রঞ্জিত বলল... তবে আমি আজ একটু অন্য কথা বলব হোস্টেলের বিষয়ে... আমাদের ২০০২-০৫ ব্যাচের সুখস্মৃতির পাশাপাশি দুখস্মৃতিও আছে...। যদিও সেটা দুঃখ না বলে যুদ্ধ বলা ভালো.... নিজেদের টিকে থাকার জন্য হোস্টেলকে টিকিয়ে রাখার যুদ্ধ।

আমরা যখন সেকেন্ড ইয়ার... স্বাভাবিক ভাবেই... মেস পরিচালনার দায়িত্বে...তখনই আশেপাশে দুটো কলেজ চালু হয়ে যায়... সেটা অবশ্যই আনন্দের বিষয়, কিন্তু আমাদের হোস্টেলের জন্য বিষাদ বয়ে নিয়ে আসে... আমরা সেই বছর মাত্র ১২ জন নতুন ভাই-কে হোস্টেলে পাই.... পরে আবার দুজন অন্য কোথাও চলে যায়।

হোস্টেল টিকিয়ে রাখার যে যুদ্ধ আজ আমরা সকলে মিলে করছি... সেই যুদ্ধের 'হাতেখড়ি' তখনই আমাদের ব্যাচের হয়ে যায়, আমার স্পষ্ট মনে আছে... টানা চার মাস আমরা আমিষ মিল চোখে দেখিনি, চেখেও দেখিনি... বলা ভালো আমরা ফাণ্ডের অভাবে কিনতে পারিনি... বাবা ফাণ্ডের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ে।

অস্থির এক সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলাম আমরা, কি ভাবে ওভারকাম করব... কি ভাবে হোস্টেল রানিং রাখব... এগুলো পড়াশোনার পাশাপাশি আরেকটা সাবজেক্ট হয়ে দাঁড়ায়।

কি কি কাটছাঁট করা যায়... খবরের কাগজ বন্ধ করব কিনা, মিলচার্জ বাড়াব কিনা, খাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে থেকে কিভাবে খাবার নষ্ট কমানো যায়... এগুলো জীবনের অঙ্গ হয়ে যায়।

ঠিক সেই বছরে গোদের উপর বিষফোঁড়া হিসাবে ইলেক্ট্রিক বিল চলে আসে দেড় লাখ টাকা। কলেজ থেকে ডেকে পাঠানো হয়... বলা হয় এখন থেকে হোস্টেলকেই নিজেদের ইলেক্ট্রিক বিলের দায়িত্ব নিতে হবে... অনেক অনুরোধেও কাজ হচ্ছিল না... অবশেষে আমার রাষ্ট্র বিজ্ঞানের টিউশন টিচার প্রেমপ্রকাশ চক্রবর্তী (যিনি তৎকালীন সময়ের GB মেম্বার) তাঁকে দিয়ে বর্ধমান ইউনিভার্সিটিতে অনুরোধ পাঠানো হয় এবং অবশেষে কাজ হয়।

কিন্তু তার প্রশ্ন ছিল এত বিল কেন এল সেটা তো তোরা উদ্ধার করতে পারবি... নিশ্চয়। শুরু হল নিজেদের বিরুদ্ধে নিজেদের যুদ্ধ... রুমে রুমে সার্চিং করে উদ্ধার এবং বাজেয়াপ্ত করলাম হিটার এর কয়েল... পরবর্তী কালের জন্য আবার ধরা পড়লে তার জন্য ফাইন চালু করলাম। প্রকাশ্যে তাদের নাম আনতে চাই না... কিন্তু

কেন করেছিল তার ব্যাখ্যাটা এখানে জানাতে কোন বাধা নেই... শীতকালে তারা চৌকির তলায় হিটার এর কয়েল চালিয়ে লেপ ঢাকা দিয়ে ফ্যান ফুল স্পিডে চালিয়ে ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়ে অনাবিল সুখ অনুভব করত... যাই হোক, পরের বছর ইলেক্ট্রিক বিল স্বাভাবিক...।

এরপর ট্যুর করতে গিয়ে হোঁচট... ফান্ড বাড়ন্ত, অনেকেই যাব না বলাতে আরো সমস্যা... ট্যুর এর আগে বেশ করে কজনের বাড়ি গিয়ে একপ্রকার তুলে নিয়েই এলাম... ট্যুর সম্পন্ন হল।

অবশেষে এল নতুন বছর, নতুন ব্যাচ ভর্তির সময়... আমরা কলেজের পারমিশন নিয়ে হোস্টেলের বিষয়ে অ্যাড করতে লাগলাম... পালা করে করে কলেজের গেটে, ছাত্র সংসদের অফিসে, ভর্তি ফিস জমা দেওয়ার কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থেকে নতুন স্টুডেন্টদের হোস্টেলে থাকার বিষয়ে বোঝাতে লাগলাম, র‍্যাগিং এর ভয় কাটাতে লাগলাম... হোস্টেলের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার কথা বললাম... সেই বছরে হোস্টেলে নতুন সদস্য ভর্তি স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গেল... বাবাফান্ড দুকূল ছাপিয়ে গেল... সত্যানন্দ ছাত্রাবাস আবার নিজের গতিতে এগিয়ে চলল।

সুখস্মৃতি তো অনেক আছে... সেগুলো বলার প্রাক্তনীও অনেক আছে। আমি নাহয় টিকে থাকার এবং টিকিয়ে রাখার গল্প হলেও সত্যিটা সবার সামনে তুলে ধরলাম... আমি আমার মুখ দিয়ে এই কাহিনি শোনালেও এই কাজে তৎকালীন সকলের সহযোগিতা, সঙ্গ এবং ভালোবাসা আমাদের ব্যাচ (২০০২) পেয়েছে... আর স্বামী সত্যানন্দদেবের আশীর্বাদ তো অবশ্যই আমাদের মাথার উপর ছিল... না হলে পরের বছরগুলোতে হোস্টেল চলত কিনা ঈশ্বর জানেন।

এই যুদ্ধ করতে করতে হোস্টেলকে কখন যে ভালোবেসে ফেললাম জানি না... আর সেখান থেকে বেরোতে পারলাম না... আজও না...

—সুব্রত কুমার সাহা, ০৪.০৭.২০২৫

জানা ছিল না। জীবনের প্রথম সংগ্রাম। যেটা হোস্টেল থেকে শুরু হয়েছিল। খুব ভালো লাগল। হোস্টেলই আমাদের জীবনযুদ্ধে লড়তে শিখিয়েছে, এটা আমরা হয়ত সবাই স্বীকার করব।

—সন্দীপ দাস, ০৪.০৭.২০২৫

শব্দছকে ছাত্রাবাস

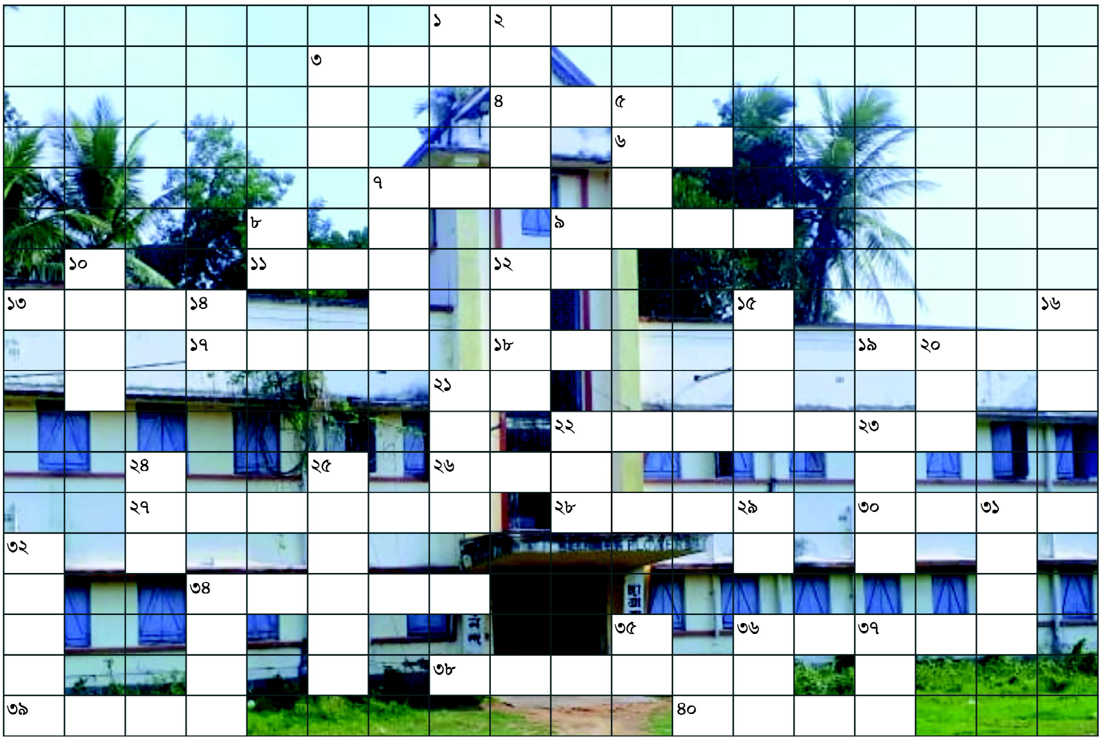

পাশাপাশি :

১. ছাত্রাবাসের প্রতিষ্ঠাতা মহান মানুষ মানি, কৃষ্ণানন্দ নামেও যাঁকে চিনি (চার অক্ষরে)

৩. পুজো আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ, মাটির ওপর নকশা রঙিন, টানে মন (চার অক্ষরে)

৪. বাঁশের মাথায় বিরাজমান, চেঁচিয়ে শোনায় কথা বা গান

৬. ডাইনিংয়ের সবুজ ডর, ফার্স্ট ইয়ারে ভয়ের জ্বর

৭. হিসেব নিকেশ হয়, ম্যানেজারের ভয়

৯. ছাত্রাবাসের প্রথম যুগের খুঁটি, বন্ধু গোয়েন্দা দুর্দান্ত জুটি

১১. চপ রুটি চা, ওর দোকানে যা

১২. মনে প্রথম কয়েকটা দিন রয়, তারপরে সে কোথায় উড়ে যায়

১৩. ছুটি আছে, তাই আজ রুমে, ঘ্যাঁট খেয়ে ডুবে যাব ________

১৭. ছাত্রাবাসের নামের ভিতর প্রাণের মানুষ থাকেন, আশীর্বাদের পরশ-মাখা অদৃশ্য হাত রাখেন

১৮. হাত বাড়ালেই হাতেতে হাত, সম্পর্ক এমনি নিখাত

১৯. হাঁড়িকুড়ি নিয়ে যাই কোন দিকে? শীতকালে বাসে করে ________।

২১. সত্যানন্দ ছাত্রাবাসে যাও, ________ সুন্দর হও

২৩. সিঁড়ির পাশের স্ট্যান্ডে থাকো, দেশ বিদেশের খবর রাখো

২৫. আমাদের এক ধাপ, সেমেস্টারের নয়, পৃথিবীর এক পাক ঘুরে আসা হয়

২৭. আনুষ্ঠানিক সাঙ্গ খেলা, ছাত্রাবাসকে বিদায় বলা

২৮. ছাত্রাবাসের ওয়াল ম্যাগ-এ, কলেজবেলার কলম জাগে

৩০. খাবো না যে, বলব তা কাকে ভাই? বলব কি,

লিখে দিয়ে বাড়ি যাই

৩৪. অনেক রুমেই থাকত জানি, মুড়ি রাখার পাত্রখানি

৩৬. ছাত্রাবাসের গেটের মাথায় চারকোনা ছাদ, ছাদের মাথায় আড্ডা দিয়ে কাটত কত রাত

৩৮. নিতাইদাকে সবাই চিনি, পুরো নামটা কেউ কি জানি?

৩৯. ছাত্রাবাসে আসার কারণ আসল, জীবনযুদ্ধে ফলায় সঠিক ফসল

৪০. ঘরছাড়াকে প্রথম ভোলায় শোক, ছাত্রাবাসে আমার ঘরের লোক

উপর নিচ :

২. দেখার মত চেহারাখানি, আলুসেদ্ধ-র নাম কি জানি?

৩. 'বেগ' নই তো আমি, তার থেকেও দামি (তিন অক্ষরে)

৫. স্নান করো জল ভরো কাচাকুচি, সেখানেই মুখ ধুয়ে কুলকুচি

৭. ব্যক্তিত্ব ভীষণ দামি, কলেজ মোদের সমনামী

৮. টাকা যদি বেঁচে যায়, ________ ফাণ্ড বড় হয়

৯. শিখিয়েছে আমার ছাত্রাবাস, হেরে যাওয়ার উল্টোদিকে বাস

১০. হোস্টেল সারা, পরীক্ষার আগে যেন '________ তারা'

১২. কোর্ট কাট, নেট টাঙ্গা, আন বল, হাতে হাতে বল মেরে খেলি চল

১৪. এই কমিটির সবাই রাজা, বাজার ফাঁকির দেবেন সাজা

১৫. নামখানা ভারী বেশ যেন সর্দার, আসলেতে চাপ খুব—মেস________

১৬. ব্যাট বলের খেলা, কাপ জিতেছি মেলা

২০. পড়াও হয় ফাঁকিও হয়, বাংলায় মহাবিদ্যালয়

২১. উত্তেজনায় ভরা, 'সব খেলার সেরা'

২২. বাড়ি থেকে আনা টাকা, মাস গেলে কেন হয় ফাঁকা

২৩. আয় ব্যয়ে নেই মিল, অডিটেতে মুশকিল

২৪. ছাত্রাবাসের সবার মাথা, সুপার সে নয়, বন্ধু-দাদা

২৫. ক্ষিদে ক্ষিদে পাচ্ছিল আনমনে, ঢং ঢং আওয়াজেতে চনমনে

২৯. রিইউনিয়ন স্টেজের পেছনে ঘর, প্রথম দুটো ছেড়ে দিয়ে ধর

৩১. কুক বা হেল্পার বাড়ি ফিরে যান, কাজ শেষে এমনই জীবন কাটান

৩২. তোমায় মনের বইয়ের তাকে রাখি, তোমার মাঝে তোমারই নাম লিখি

৩৪. এখানেই ডাল তেল কেনা, মাস গেলে টাকা দিয়ে যা না

৩৫. মাসশেষে জোর খাওয়া হবে নাতো রোজ রোজ, ইংরেজি বলব না বাংলায়________ভোজ

৩৬. টিভিরুমে খেলি চারজন, হাতের আঙ্গুলে থাকে মন

৩৭. সবকিছুরই সীমা থাকা ভালো, শেষ ক্লু দিলাম, ইংরেজিতে বলো

2025 Nobel Prize laureates along with their categories and countries:

Catagory	Laureate(s)	Country / Affiliation	Achievement
Physics	John Clarke; Michel H. Devoret; John M. Martinis	USA / France	For the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit.
Chemistry	Susumu Kitagawa; Richard Robson; Omar M. Yaghi	Japan / Australia / USA	For the development of metal-organic frameworks (MOFs), porous materials useful for gas storage and purification.
Physiology or Medicine	Mary E. Brunkow; Fred Ramsdell; Shimon Sakaguchi	USA / Japan	For their discoveries concerning peripheral immune tolerance and regulatory T cells (Treg).
Literature	László Krasznahorkai	Hungary	For his compelling and visionary œuvre that reaffirms the power of art amid apocalyptic terror.
Peace	María Corina Machado	Venezuela	For her leadership promoting democracy and human rights in Venezuela.
Economic Sciences	Joel Mokyr; Philippe Aghion; Peter Howitt	USA / France / Canada	For their work explaining innovation-driven economic growth and the theory of creative destruction.

কিছু পুরস্কারের আকর্ষণ চিরন্তনী। বিশ্বশান্তির কথা ভেবে যে পুরস্কারের জন্ম তাকে এই সত্যানন্দ ছাত্রাবাসের বন্ধুত্বের অঙ্গন থেকে কুর্নিশ।

‘আনন্দদীপ’-২০২৪ সংখ্যাকে যাঁরা অর্থ সাহায্য করেছেন :

Sl	Name	Year	Amount
1	Bubul Sarkar	1995	300
2	Sibasish Mondal	1985	500
3	Tuhin Dey	1993	200
4	Palash Sinha	1994	150
5	Jaladbaran Dutta	1966	1000
6	Bhumananda Sinha	1981	500
7	Ranjit Kumar Sen	2002	200
8	Sunit Saha	2001	600
9	Manabendra Roy	1997	411
10	Sukanta Pal	1997	1000
11	Surajit Roy	1995	2000
12	Bishnu Charan Pal	2004	200
13	Palash Banerjee	1984	1000
14	Biswajit Saha	1997	200
15	Rakesh Bhakat	1998	400
16	Malay Das	1997	128
17	Sandip Das	1987	1000
18	Mostafa Kamal	1983	200
19	Subrata Kumar Saha	2002	400
20	Kiriti Banerjee	1987	400
21	Sandeep Goldar	2002	400
22	Rajesh Das	1994	400
23	Paritosh Mondal	1982	1000
24	Kanchan kumar Ghosh	1982	300
25	Tapas Saha	1992	100
26	Supriya Majumdar	1993	100
27	Kalikinkar Mondal	2001	300
28	Akash Bhattacharyya	1987	200
29	Sekhar Majumdar	1993	100
30	Waquif Sahin	1995	500
31	Prithwis Das	1995	500
32	Aniruddha Biswas	1996	500
33	Amit Kumar Das	1998	300

34	Swastik Mondal	1995	500
35	Somprakash Mukharjee	1998	300
36	Giridhari Das	2000	111
37	Arabinda Shee	2000	500
38	Murari Krishna Saha	2000	500
39	Monojit Laha	1995	500
40	Goutam Kumar Mondal	1982	900
41	Koushik Bhattacharjee	2004	500
42	Shamim Reja	2004	400
43	Siddhartha Ghosh	1989	500
44	Debraj Banarjee	1989	500
45	Animesh Mondal	1993	2000
46	Rudra Pratap Mukharjee	1998	400
47	Basanta Kumar Mondal	1990	100
48	Debangshu Mondal	1995	400
49	Nayan Mondal	1993	200
50	Mosarof Hossain	1992	500
51	Shovon Kumar Mukhopadhyay	1982	600
52	Indranil Ghosh	1988	300
53	Nur Ali (Chhoto)	1997	400
54	Dipayan Dey	1998	900

LIST OF MEMBERS OF SATYANANDA CHHATRABAS ALUMNI 2025

1. Jaladbaran Dutta 1966
2. Dilip Kumar Sarkar 1975
3. Anath Nath Ghosh 1975
4. Md Nur Uz Zaman 1975
5. Malay Bhattacharjee 1977
6. Tushar Bhattacharya 1979
7. Sudam Chandra Ray 1979
8. Md Kumairuddin Shaikh 1980
9. Bhumananda Sinha 1981
10. Md Anarul Haque 1981
11. Abdul Ahad Sk 1981
12. Haradhan Mukherjee 1981
13. Adyanath Ghosh 1981
14. Goutam Pal 1981
15. Shovon Kumar Mukhopadhyay 1982
16. Paritosh Mondal 1982
17. Goutam Mondal 1982
18. Eftekhar Hossain 1982
19. Kanchan Kumar Ghosh 1982
20. Sunil Ghosh 1982
21. Deb Dulal Das 1983
22. Abdus Sattar 1983
23. Sirajul Islam 1983
24. Banamali Mondal 1983
25. Md Mostafa Kamal 1983
26. Abul Basar 1983
27. Arun Kumar Sen 1983
28. Mondal 1983
29. Subrata Chowdhury 1983
30. Milon Kumar Saha 1983
31. Kalyan Mitra 1984
32. Sagar Kumar Das 1984
33. Md Isha 1984
34. Palash Banerjee 1984
35. Md Sadek Ali Biswas 1984
36. Md Kamiruddin 1984
37. Sibasish Mondal 1985
38. Lakshman Chandra Saha 1985
39. Md Abdul Khaleque 1985
40. Mondal 1985
41. Dipak Datta 1985
42. Tapas Kumar Bhattacharyya 1985
43. Md Hamidul Haque 1985
44. Giridhari Mal 1985
45. Manoranjan Ghosh 1985
46. Pranab Kumar Debnath 1985
47. Sukumar Mandal 1985
48. Anup Kumar Sarkar 1986
49. Partha Sarathi Dafadar 1986
50. Md Abdur Rouf 1986
51. Arup Kumar Dutta 1986
52. Prasun Kumar Ghosh 1986
53. Md Saduddin 1986
54. Partha Sarathi Dafadar 1986
55. Sandip Das 1987
56. Akash Bhattachariya 1987
57. Ajoy Kumar Chakraborty 1987
58. Amal Kumar Dutta 1987
59. Md Hedayetulla 1987
60. Tushar Mondal 1988
61. Lakshman Chandra Ghosh 1988
62. Prodipta Mazumder 1988
63. Indranil Ghosh 1988
64. Shish Mohammad 1988
65. Ramprasd Das 1988
66. Gopinath Saha 1989
67. Chandan Das 1989
68. Biplobjit Ghosh 1989
69. Md Fozlul Korim 1989
70. Rabindranath Das 1989
71. Debraj Banarjee 1989
72. Rajendra Dey 1989
73. Siddhartha Ghosh 1989
74. Samim Kabir 1990
75. Palash Roy 1990
76. Manas Kumar Ghosh 1990
77. Biplab Kumar Datta 1990
78. Jayanta Mandal 1990
79. Biplab Majumder 1990
80. Mangal Kumar Sarkar 1991
81. Shibdas Garain 1991
82. Arjun Mondal 1991

83.	Brindaban Das	1991	134.	Arun Halder	1996
84.	Sujit Kumar Das	1992	135.	Sudha Krishna Mondal	1996
85.	Mossarof Hossain	1992	136.	Debakinandan Maji	1997
86.	Tapas Saha	1992	137.	Subhendu Mondal (Eng)	1997
87.	Tuhin Dey	1993	138.	Biswajit Saha	1997
88.	Bimal Choudhury	1993	139.	Maloy Das	1997
89.	Sunirmal Saha	1993	140.	Subhendu Mondal (Math)	1997
90.	Sudhi Ranjan Ganguly	1993	141.	Mridul Haque	1997
91.	Shekhar Majumdar	1993	142.	Abhijit Saha	1997
92.	Supriyo Majumdar	1993	143.	Pravakar Sarkar	1997
93.	Suman Chakraborty	1993	144.	Nur Ali (Miltan)	1997
94.	Nayan Mandal	1993	145.	Manabendra Roy	1997
95.	Ashis Kumar Sen	1993	146.	Krishna Das Layek	1997
96.	Animesh Mondal	1993	147.	Sukanta Pal	1997
97.	Bimal Kumar Paul	1993	148.	Swapan Kumar Bagdi	1997
98.	Subrata Mondal	1993	149.	Nur Ali (Chhoto)	1997
99.	Chandan Biswas	1993	150.	Bhabani Prasad Das	1997
100.	Nilmani Pal	1993	151.	Koushik Sinha (UN)	1997
101.	Uday Kumar Nayak	1993	152.	Rakesh Bhakat	1998
102.	Md Mustafijur Rahaman	1993	153.	Amit Kumar Das	1998
103.	Bikash Kumar Garain	1993	154.	Somprakash Mukherjee	1998
104.	Rajesh Das	1994	155.	Barun Ghosh	1999
105.	Tushar Mondal	1994	156.	Tushar Mondal	1999
106.	Palash Sinha	1994	157.	Rudrapratap Mukherjee	1999
107.	Kunal Kanti Singha Roy	1994	158.	Md Abdul Kader	1999
108.	Goutam Mondal	1994	159.	Ahasan Habib	1999
109.	Kajal Chakraborty	1994	160.	Achintya Shil	1999
110.	Raj Kumar Ghosh	1994	161.	Soumen Dey	2000
111.	Udayan Pal	1994	162.	Ramkrishna Pal	2000
112.	Partha Pramanik	1994	163.	Prakash Ghatak	2000
113.	Bubul Sarkar	1995	164.	Arabinda Shee	2000
114.	Surajit Roy	1995	165.	Golam Ambia	2000
115.	Debangshu Mondal	1995	166.	Biswajit Mondal	2000
116.	Bidhan Sarkar	1995	167.	Chandan Sarkar	2000
117.	Somenath Ghatak	1995	168.	Md Ali Reza	2000
118.	Arifuzzaman	1995	169.	Mosaraf Hossain	2000
119.	Tarun Saha	1995	170.	Murari Krishna Saha	2000
120.	Amar Mondal	1995	171.	Purna Chandra Sarkar	2000
121.	Manas Biswas	1995	172.	Rajesh Ghosh	2000
122.	Waquif Md Sahin	1995	173.	Sah Alam Shaikh	2000
123.	Kamalesh Ghosh	1995	174.	Deabrata Ghosh	2000
124.	Monojit Laha	1995	175.	Tapesh Pal	2000
125.	Manas Kumar Garai	1995	176.	Anwar Hossain	2000
126.	Md Aulad Hossain	1995	177.	Debashis Mishra	2000
127.	Jayanta Dhar	1996	178.	Sahebul Islam	2000
128.	Jahirul Islam	1996	179.	Giridhari Das	2000
129.	Bappaditya Pramanik	1996	180.	Nilotpal Bagdi	2001
130.	Aniruddha Biswas	1996	181.	Kali Kinkar Mondal	2001
131.	Bhima Pada Das	1996	182.	Pintu Mukherjee	2001
132.	Abu Taher Masum Raza	1996	183.	Sunit Saha	2001
133.	Ashutosh Das	1996	184.	Dibyendu Mondal	2001

185. Mithun Das	2001	221. Ashok Konai	2004
186. Hedayetulla Mandal	2001	222. Aditya Dey	2004
187. Rajen Mondal	2001	223. Soumen Mandal	2004
188. Maidul Islam	2001	224. Amar Gupta	2004
189. Arup Shee	2001	225. Bidyut Pal	2004
190. Bhaskar Mondal	2001	226. Prabhat Pal	2004
191. Sasikanta Bhakat	2001	227. Jibon Kumar Pal	2004
192. Samir Kumar Das	2001	228. Pranab Ghosh	2005
193. Abir Sen	2001	229. Braja Sundar Pal	2005
194. Nasim SK	2001	230. Uttam Ghosh 2005	
195. Hasanuz Zaman	2002	231. Jibananda Bhattacharyya	2005
196. Kanchan Bhattacharjee	2002	232. Sushil Kumar Pal	2005
197. Subrata Kumar Saha	2002	233. Nitish Chandra Dey	2005
198. Ranjit Kumar Sen	2002	234. Brindabon Bhalla	2005
199. Bahlul Haque	2002	235. Ezehar Alam	2006
200. Abhishek Sarkar	2002	236. Goutam Mal	2006
201. Sandeep Golder	2002	237. Indrajit Nandi	2006
202. Chandan Sarkar	2002	238. Md Kudrat E Khoda	2006
203. Partha Mondal	2002	239. Palash Ghosh	2006
204. Amjad Hossain	2002	240. Bapinur Naser	2006
205. Debasis Lala	2002	241. Pranab Ghosh	2006
206. Jahangir Hossain	2003	242. Tapash Das	2006
207. Krishna Chandra Dhibar	2003	243. Suvendu Mondal	2006
208. Pradip Kumar Bagdi	2003	244. Laxman Soren	2006
209. Ananta Mondal	2003	245. Sailen Dolui	2006
210. Arpan Mukharjee	2003	246. Ratan Tudu	2006
211. Jiban Sarkar	2004	247. Subrata Thander	2006
212. Bishnu Charan Pal	2004	248. Shantanu Sarkar	2006
213. Suresh Kumar Pal	2004	249. Ajoy Dey	2007
214. Md Samim Reja	2004	250. Siddhartha Mondal	2007
215. Moidul Islam	2004	251. Saptam Mondal	2007
216. Partha Sarathi Pal	2004	252. Tirtha Choudhury	2007
217. Koushik Bhattacharyya	2004	253. Biswajit Das	2007
218. Pravas Chandra Dey	2004	254. Niranjan Pal	2007
219. Sandip Mondal	2004	255. Mahammad Aziz	2008
220. Provat Pal	2004		

SATYANANDA CHHATRABAS, SAINTHIA
REUNION CUP 2024

A 12 OVER FRIENDLY CRICKET MATCH HELD AT SAINTHIA ABHEDANANDA MAHAVIDYALAYA SPORTS GROUND on 15.12.2024 at 07.00 am.
BISHNU ELEVEN Vs KALI ELEVEN
KALI ELEVEN won the toss and chose to bowl first.

SCORECARD

BISHNU ELEVEN
MANAB : 16
BROJO : 20
AMZAD : 38
SUSHIL : 12
BISHNU : 10
BUBUL : 0
BAHLUL : 4*
Extra : 12
Total : 112 / 6 in 20 overs.

Bowlers -
MOLOY : 3 ov. 1 wkt KALI : 3 ov. 3 wkt PARTHA : 3 ov. 1 wkt SITUL : 2 ov. 0 wkt SUBHENDU : 1 ov. 0 wkt

Target : 113 in 12 overs.

KALI ELEVEN
MOLOY : 33
PARTHA : 8
KALI : 69*
TAPU : 4*
Extra : 0
Total : 114 / 2 in 9 overs

Bowlers -
BAHLUL : 2 ov. 0 wkt BUBUL : 3 ov. 1 wkt AMZAD : 1 ov. 0 wkt JIBA : 1 ov. 0 wkt BISHNU : 2 ov. 1 wkt

KALI ELEVEN won the match by 8 wickets.

পত্রিকার আঁতুরঘরে।

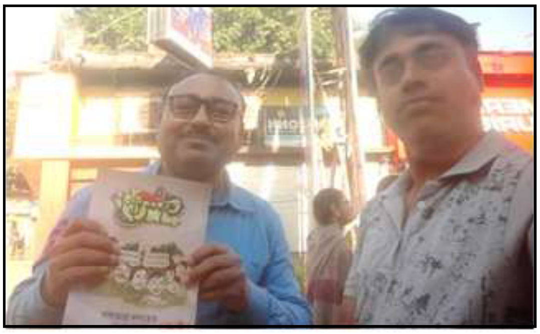

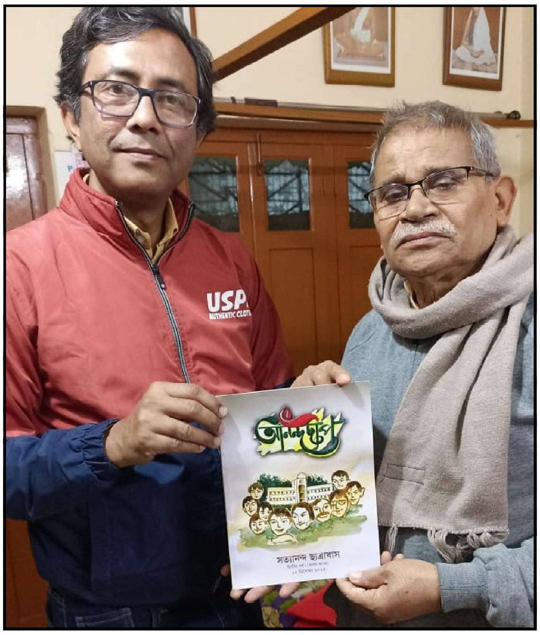

বর্ষীয়ান প্রাক্তনীর বাড়িতে যখন পৌঁছে যায় আনন্দদীপ।

খেলার মাঠের ভ্রাতৃত্ব...

ছিলাম... আছি... থাকব...

রি-ইউনিয়নে হেল্থ ক্যাম্প।

রি-ইউনিয়ন মঞ্চ ২০২৪

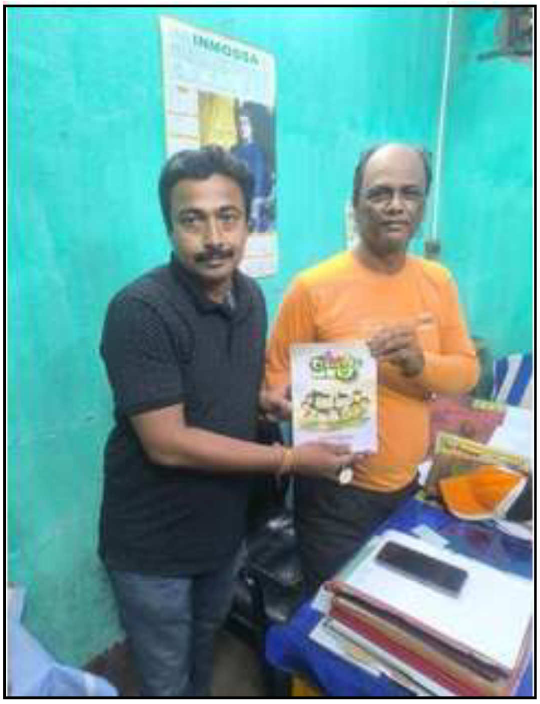

পত্রিকা পৌঁছে গেল দূর দূরান্তে...

সত্যানন্দ
ছাত্রাবাস

ANANDADEEP – A LITERARY MAGAZINE

Published by the Ex-Boarders of Satyananda Chhatrabas, Sainthia, Birbhum Rs. 100.00